শারদীয়া

আ

গে

য়ী

ষষ্ঠ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৬২ | প্রথম সংখ্যা

এবার পূজায়

স্বর্ণ, হীরক ও নানা প্রকার গ্রহরত্নের

একমাত্র অভিজাত ব্যবসায়ী

ভৌমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্

রূপদক্ষ শিল্পীদের ঐশী প্রতিভার অনুপম

সৃষ্টিই আমাদের বিশেষত্ব!

নিউমার্কেট

(বালুরঘাট)

শারদ লাইব্রেরী

পূজো সেল ! পূজা সেল !!

পূজার বাজার এবার কোথায় ?

জনতা বস্ত্রালয়়ে

—০ যেখানে সস্তা ও বিরাট স্টক ০—

মা, ভাই, বোনেদের মুখের হাসি ফুটিয়ে তুলে
শারদ-উৎসবকে মুখর করে দিবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টায়
অতি আধুনিক ডিজাইনের নানা প্রকার সাড়ী, ছিট ও ধুতির

সম্পূর্ণ নূতন স্টক লইয়া জনতা বস্ত্রালয় যে প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনাদের
শুভ পদধূলির জন্য সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

বিনীত—
জনতা বস্ত্রালয়
বালুরঘাট।
(বাজারে প্রাচ্যভারতী রাস্তার মোড়ের ঠিক বিপরীত দিকে)

P24,077

পূজার দিনের আতিথেয়তা

পূজার দিনে—উৎসব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতেরা
বাপুজী টি-য়ে যেমন খুশী হন তেমন আর কিছুতেই নয়।

বাপুজী টী

সুগন্ধি, সুস্বাদু, তৃপ্তিকর ও আনন্দবর্ধক

বাপুজী ষ্টোর্স
বালুরঘাট ঃ পশ্চিম দিনাজপুর।

শারদীয়া দুর্গাপূজায়

অভূতপূর্ব আয়োজন

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয়

বিবিধ দ্রব্য সম্ভারে

সুসজ্জিত হয়েছে

আপনাদের

চিরপরিচিত

কমলালয় ষ্টোর্স

বালুরঘাট ঃ পশ্চিম দিনাজপুর।

কমলালয় ষ্টোর্স

কাম্মিত্র নিয়েছে

আপনাদের আনন্দমুখর দিনগুলিকে মধুময় ও সার্থক করে তুলবার।

নিবেদক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাণী মন্দির

বালুরঘাট মেন রোড, পঃ দিনাজপুর।
আসন্ন পূজায় বাণী মন্দিরে বিপুল
আয়োজন আপনাদের প্রয়োজন
অনুযায়ী উপহার দেবার মত
সুন্দর সুন্দর গ্রন্থাবলী,
নভেল, নাটক প্রভৃতি
পুস্তকাবলীতে সমৃদ্ধ। ইহা ছাড়া
কাগজ, পেনসিল, পেন.
কালী ও সুমিষ্ট গন্ধ-

চাও পাবেন।
এখনি খোঁজ করুন।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

শারদীয়া পূজায়
মাকে
আবাহনের সঙ্গে
আনন্দ অভিবাদন জানাই
গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোকষদের

দেবীদাস প্রাণগোপাল

আপনাদের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান।
এখানে মোটরের পার্টস্, টায়ার, টিউব,
মবিলওয়েল ও বাটারী ইত্যাদি সর্বদা
বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর

সঞ্জীবনী পাইস হোটেল

বালুরঘাট, কাছারী রোড।
রুচি-সম্মত আহার পরিবেশন ও পরিচ্ছন্নতাই
আমাদের বৈশিষ্ট্য। মিল ও পাইস
সিষ্টেমে খাওয়ান হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
প্রোঃ—শ্রীগণেশচন্দ্র পাল

শারদীয়া দুর্গোৎসবে
সুচারু অলঙ্করণ নর-নারী জীবনের
একটি বিশিষ্ট অঙ্গ!

আর, এন, দাস এণ্ড সন্স

জুয়েলার্স, ঘড়ি
নিপুণ কারুশিল্প-বোধের নিখুঁত স্পর্শে
রূপায়িত সেই অলঙ্করণের
স্বীকৃতি জানাচ্ছে
শারদীয়া মহাপূজায় এই আমাদের
আবেদন।

ডি, সি, ষ্টুডিও

প্রাচ্যভারতী রোডঃ বালুরঘাট
এতদ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে
আপনাদের পাশপোর্ট ও সর্ব্বপ্রকার সাই-
জের ফটো উত্তম ক্যামেরার সাহায্যে
সুদক্ষ ফটোগ্রাফার দ্বারা সুনিপুণ
ভাবে তুলতে তোলা হয়।
এমেচার ফটোগ্রাফারের জন্য ডেভেলপমেণ্ট
ও প্রিণ্ট এবং এনলার্জমেণ্টের সুবন্দোবস্ত আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ফটোগ্রাফার—
শ্রীদীনেশচন্দ্র মহান্ত
বালুরঘাট।

রূপ রচনায়—

কিরণ ষ্টোরের

প্রসাধন সম্ভার

সো
পাউডার
কেশতৈল
আলতা
ও
সাবান

কিরণ ষ্টোর্স

বালুরঘাট।

দি বালুরঘাট
বীণাপাণি টেলারিং স্কুল

ছয় মাসের মধ্যে শিক্ষার্থীকে
সকল রকম কাটিং শিক্ষা
দেওয়া হয়।

এখানে শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুর সব রকম পোষাক তৈরী করে দেওয়া হয় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়।

শ্রীগুরুপদ সাহা
মাষ্টার টেইলার
নিউ মার্কেট, বালুরঘাট।

মাতৃ পূজায় শ্রেষ্ঠ
নারীর রূপকে, অপরূপ করে
নিখুঁত শিল্পীর সুনিপুণ অঙ্গ

কনক মহল

সোনা ও রূপার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ শ্রীপশুপতি সিংহ
প্রাচ্যভারতী রোড, বালুরঘাট।

শ্রেষ্ঠ
উৎসবে
শ্রেষ্ঠ
উপহারের

প্রখ্যাত বিপণি

জুয়েলারী হাউস

নিউ মার্কেট, (বালুরঘাট)

অভিজাত স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ী

নর্থ বেঙ্গল সাইকেল ষ্টোর্স

মেন রোড—বাজার বালুরঘাট।

এখানে নূতন সাইকেল, সাইকেল রিক্সা ও সাইকেলের সকল রকম পার্টস্ বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে। সাইকেল, গ্রামাফোন ও সকল রকম লাইট মেরামত করা হয়।

প্রোঃ - শ্রীসুবোধকুমার দত্ত
মেন রোড, বাজার, বালুরঘাট

As -/8/ C
CENTRAL LIBRARY

বা পূজার দিনগুলিকে আ

সিঞ্চিকে

দার্জ্জিলিং টি

বাল্লুরঘা

আসন্ন মহা পূজায়

বিভিন্ন প্রকারের রুচিসম্পন্ন খাবার

পেতে হ'লে

মিস্টিমুখে

আসুন !

অর্ডার অনুযায়ী ভাল মিষ্টি সরবরাহ

করে থাকে 'মিষ্টিমুখ'

আপনাদের সহযোগিতা কামনা করে।

প্রোঃ—শ্রীনিতাই ঘোষ

কাছাড়ী রোড, বালুরঘাট।

Drinks fr

Lunches

শরতের উৎসবের দিনগুলি আবার সমাগত

শুভেচ্ছা ও খুসিতে চারিদিক ভরপুর

প্রতি গৃহে আজ আনন্দের সাড়া

পড়ে গেছে

এই আনন্দ হিল্লোলকে মুখর করে তুলতে পারে

আপনাদের

চিরপরিচিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান—

কল্পতরু এজেন্সী

মেন রোড (বালুরঘাট)

আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করে।

আমাদের সর্ব্বাধুনিক ঢাকাই, বেনারসী, বাঙ্গালোর, মহীশুর,

মুর্শিদাবাদ শাড়ী, পথিক, মনিপুরী, ছাপা শাড়ী,

ব্লাউজ, শার্টিং সর্ব্বপ্রকার কাপড় ও শিট

কাপড় সর্বদা বিক্রয়ার্থে

মজুত থাকে।

পপী টী'র

মনোরম গন্ধবর্ণ ও স্বাদের আমেজ

কে না জানে—

—পপী টী হাউস—

এখানে আরো আয়োজন আছে, সবরকম

ষ্টেশনারী, ঘড়ি, লেদার সুটকেস ও

নভেলটী ইত্যাদি।

প্রোঃ—পপী টী হাউস

চৌরঙ্গী, বালুরঘাট।

উৎসবে, উপহারে

ও

ব্যবহারে

আমাদের খাগড়া, নবদ্বীপ ও

কলিকাতার বাসন শ্রেষ্ঠ—

মহালক্ষ্মী বাসন স্টোর

নিউ মার্কেট, বালুরঘাট।

জর্জ্জ কমার্শিয়াল কলেজ।

—বালুরঘাট—

এতদ্বারা ছাত্রছাত্রীদিগকে জনান যাইতেছে যে বর্ত্তমানে এই কলেজ হইতে পাশ করিবার পর, এখান হইতে এমপ্লয়মেণ্ট অফিসে নাম রেজীষ্টারী করবার ব্যবস্থা করান হয়! ছাত্রছাত্রীদের টাইপ রাইটিং (ব্লাইণ্ড ফোল্ড মেথড) টেলিগ্রাফী ও ষ্টেনোগ্রাফী শিখিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হইতেছে। টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেসন্স লইয়া চাকুরীর পথ সুপ্রশস্ত করিবার জন্য অতি সত্বর আবেদন করুন।

২১শে অক্টোবর হইতে ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত পূজার জন্য বন্ধ থাকিবে।

প্রিন্সিপাল

স্বদেশী সাইকেল স্টোর

এখানে সকল প্রকার নূতন সাইকেল ও পার্টস্, হাজাক, ডেলাইট, টর্চলাইট, ষ্টোভ গ্রামোফোন রেকর্ড বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে ও মেরামত করা হয়।

প্রোঃ—শ্রীশচন্দ্র ঘোষ

নিউ মার্কেট, বালুরঘাট।

কালাচাঁদ মোটর রিপিয়ারিং সপ

প্রাচ্যভারতী রোড; বালুরঘাট।

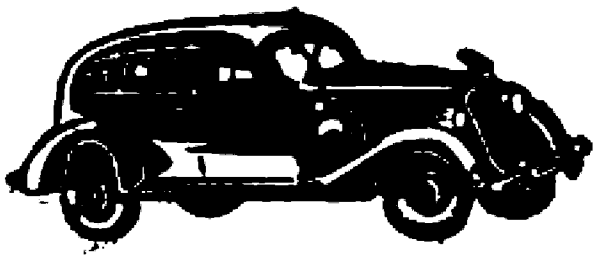

প্রোঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র সাহা

চিরন্তন শারদীয়া পূজার আগমন বার্ত্তা
বয়ে আনে আবাল বৃদ্ধ বণিতার প্রাণে
এমন দিনে
সকলেরই মনে জাগে আকর্ষণীয় রূপে সুন্দর হয়ে
উঠবার বাসনা
সেই বাসনা পূরণ ও সার্থক করে তুলবার
আয়োজন আছে
শ্রীগোপাল ষ্টোর্সে
প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা
স্বত্বাধিকারী—শ্রীক্ষিতীশ ঘোষ রায়
বুড়াকালীতলা, বালুরঘাট।

প্রতিযোগিতা মূলক মূল্যে সর্বপ্রকার
প্রসিদ্ধ বস্ত্র ও পোষাক বিক্রয় ক'রে
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত হ'তে চাই।
সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান
শ্রীদুর্গা বস্ত্রালয়
প্রসিদ্ধ বস্ত্র হোসিয়ারী ও পোষাক বিক্রেতা
মেইন রোড, ঃ বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর।

সব চাইতে আজকের দিনে সকল অন্তর
ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু
দেওয়ার আনন্দ

নির্ম্মলা বস্ত্রালয়

তার আয়োজন করেছেন

পথিক, ধনেখালি, বাঙ্গালোর, বিশ্বভারতী, শান্তিপুরী, মনিপুরী
শাড়ী ও ধুতি। আধুনিক ডিজাইনের সিট, মটকা,
তসর, গরদের পোষাক ও বস্ত্র সম্ভার।

প্রোঃ—শ্রীনিতাই চন্দ্র সাহা
নির্মলা বস্ত্রালয়
চৌরঙ্গী, বালুরঘাট।

অধ্যাপক শ্রীকুমুদবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের
ভূমিকা-সম্বলিত

কবি রাধামোহন মহান্তের

বিচিত্র ছন্দ-বন্ধে বিভিন্ন রসাশ্রিত কাব্য গ্রন্থ

—'মনোগন্ধা'—

প্রকাশিত হইল, মূল্য দুই টাকা

প্রাপ্তিস্থান—ভারতী গ্রন্থ প্রকাশনী,
ভারতী প্রেস, বালুরঘাট।
২। বালুরঘাট বুক ষ্টল, বালুরঘাট।
৩। এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোঃ লিঃ
কলেজ ষ্ট্রীট—কলিকাতা

নিতাই বিড়ি ফ্যাক্টরী

বালুরঘাট ঃ নিউমার্কেট।

এখানে নিতাই বিড়ি সকল রকম
নেপানী ও গুজরাটী তামাক
ও পাতা পাইবার
একমাত্র
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ—শ্রীহরিবোলা সাহা

রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার

বালুরঘাট বাজার, পঃ দিনাজপুর।

COLGATE

TOOTH POWDER

শারদীয়া পূজায় আপনাদের
সেবায় নিয়োজিত

বাসন্তি লণ্ড্রি

অভিবাদন গ্রহণ করুন।
প্রাচ্যভারতী রোড, বালুরঘাট।

শারদীয়ার পুণ্য দিনে—
আপনি কি চান নিজেকে ফিটফাট রাখতে
তবে আসুন

শান্তি সেলুনে

এখানে আধুনিক ও রুচিসম্মত ভাবে চুলকাটা হয়।
পরিচ্ছন্নতাই ইহার বৈশিষ্ট্য।

প্রোঃ—গুগলা ঠাকুর
কাছারী রোড, বালুরঘাট।

অসুন্দরকে সুন্দর করে তোলে সুদক্ষ দর্জির শিল্প
সৃষ্টি—নিখুত ও আধুনিক রুচি সম্মত
সুন্দর পোষাকের জন্য আজই
অর্ডার দিন—

বাণী টেলারিং

নিউ মার্কেট, বালুরঘাট।

প্রোঃ—শ্রীশ্যামাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

জনসেবায়

রাজকৃষ্ণ ফার্মেসী

চৌরঙ্গী, বালুরঘাট।
ঔষধ ও ব্যবস্থা পত্রগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে
নির্ভুল, বিশেষ যত্ন সহকারে
ব্যবস্থা ও সরবরাহ
করা হয়।

ব্যাধির জন্য ঃ—

ডাঃ সুরেন্দ্রমোহন দত্ত

এল, এম, এফ, এর সহিত আলোচনা
করুন।

কমলা বস্ত্রালয়

বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর

প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা

এখানে প্রচুর পরিমাণে হাল ফ্যাসানের

সিট, সাড়ী, ধুতি বিক্রয়ার্থে

মজুত আছে।

ঘোষ ব্রাদার্স

সল্প মূল্যে রুচি সম্পন্ন খাবার পেতে

হলে ঘোষ ব্রাদার্সে আসুন।

এখানে অর্ডার অনুযায়ী ভাল মিষ্টি

সরবরাহ করার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রোঃ—শ্রীমতিলাল ঘোষ

বাজার বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর

বুড়ামা ষ্টুডিও

আর্টিষ্ট এণ্ড ফটোগ্রাফার

বালুরঘাট।

এখানে নিখুঁতভাবে ফটো এনলার্জিং করা হয়।

অতি যত্নের সহিত দ্রুত অর্ডার সরবরাহ

করাই ইহার বৈশিষ্ট্য।

নন্দ ফার্ম্মেসী

বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর।

এখানে যাবতীয় দেশী ও বিদেশী ঔষধ, পথ্যাদি,

উইনকারনিস্ ভাইরোনা কণ্ট্রোল কেটে

পাওয়া যায়। ডাক্তারদের উচ্চহারে

কমিশন দেওয়া হয়।

নিবেদক—

ডাঃ—ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

(বিশু)

এল-এম-এফ (কলিঃ) এম বি-ও [মাদ্রাজ)

এল-এম্ (ডাবলিন)

বালুরঘাট কাঠ গোলা

নিউ মার্কেট, বালুরঘাট।

ঘর তৈয়ারীর সকল প্রকার শালকাঠ

অতি সুলভ মূল্যে পাইকারী ও খুচরা

বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

দীনেশ ফার্ম্মেসী

বালুরঘাট।

রিপ্রেজেন্টেটিভ ও ইকিষ্ট বেঙ্গল ইমিউনিটি।

বালুরঘাটের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔষধের দোকান। এখানে

যাবতীয় ঔষধ সুলভে পাওয়া যায়।

বালুরঘাট ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী

হেড অফিস :—
বালুরঘাট : পঃ দিনাজপুর
ফোন নং—৩৭

কলিকাতা অফিস :—
২নং রামলোচন মল্লিক ষ্ট্রীট

শারদ উৎসবের দিনে
সকলের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে কে ?

স্থানীয় ব্যবসায়ী-মহল নিত্য নূতন মাল আমদানী ক'রে।

শুধু কি তাই ?

না, তা নয়। এর পেছনে চাই
শক্তিশালী, বিশ্বাসী ও দ্রুত মালবহনকারী

ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী

এ দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা রাখে কে ?

কেন ? এযাবৎকাল যাহারা বিমানে মাল বহন করিয়া
সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়াছে
তাদেরই পরিচালিত একমাত্র

০ঃ বালুরঘাট ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী ঃ০

ব্রাঞ্চ অফিস :—
হিলি, : গঙ্গারামপুর, : কালিয়াগঞ্জ
রায়গঞ্জ।

নিবেদক—
বালুরঘাট ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী

দি ইণ্ডিয়ান
টিম্বার ম্যানুফাকচারিং কোং

টিম্বার মার্চেন্ট, কেবিনেট মেকারস কণ্ট্রাক্টার।

খাদিমপুর, বালুরঘাট।

সর্ব্বপ্রকার আসামী কাঠ বিক্রয় ও কাঠের যাবতীয় ফার্ণিচার তৈয়ারীর একমাত্র বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।

সুলভ মূল্যে বিক্রী ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্ডার সাপ্লাই করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

কণ্ট্রাক্টে সর্ব্বপ্রকার বাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

CITY TAILORING
Presnts its Best Compliments and Well-wishes to its innumerable Patrons & Customers.

Prop—Dhirendra Nath Sarkar
Suit Specialist
Balurghat.

কেশব লাইব্রেরী

বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর।

স্কুল কলেজের সব রকম পাঠ্য পুস্তক আধুনিক নাটক ও নভেল এবং খেলাধূলার সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

এভারেষ্ট টিম্বার ওয়ার্কস্

আমরা অর্ডার অনুযায়ী সুদক্ষ কারিগর দ্বারা সেগুণ কাঠের আসবাব পত্র তৈয়ার করি এবং বিক্রয়ের জন্যও সেগুণ কাঠ সর্বদাই মজুত রাখি।

প্রোঃ এস, এম, গুহ এণ্ড ব্রাদার্স
বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর।

—ভারতী প্রেসে—
—দপ্তরীখানা—
—খোলা হইয়াছে—

এখানে স্কুল কলেজের পুস্তক ও খাতা সুলভে সুন্দর ভাবে বাঁধাই করাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়া কোর্ট কাছারীর ও মহাজনদের যাবতীয় খাতাপত্র অল্প সময়ে বাঁধাই করিয়া থাকি। এবং স্বয়ংক্রিয় গিলোটিন পেপার কাটিং মেসিনে কাটার কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নিয়মিত ভাবে
—মাসিক ও সাপ্তাহিক—
—আত্রেয়ী—
পাঠ করুন।

—বিষয়-সূচী—

বিষয় :— পৃষ্ঠা :—

১। আগমনী—
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ১

২। আয়াহি বরদে দেবি—
শ্রীসিতেশচন্দ্র রায়
সাহিত্যভূষণ, কাব্যপুরাণরত্ন ২

গল্প :—

৩। দার্শনিকের প্রেম—
শ্রীসুমুদ চট্টোপাধ্যায় ৪

৪। মাঝির কন্যার কাহিনী—
সুভাষ সমাজদার ১৮

৫। নক্সা [কবিতা]—
সন্তোষ ভট্টাচার্য্য ২৬

৬। ডাকিনী—(গল্প)
শ্রীশিশিরকুমার সরকার ২৭

৭। হাসি ও অশ্রু [কবিতা]—
শ্রীমঞ্জুশ্রী চক্রবর্ত্তী ৩১

৮। মাছলী—(গল্প)
বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ৩৪

৯। আত্মহত্যা—(গল্প)
শ্রীশম্ভুদাস মুখোপাধ্যায় ৩৯

১০। সুটকেশ—(গল্প)
—কানাই দত্ত ৪২

কবিতা :—

১১। আধুনিক লিয়ার—
অনিল বিশ্বাস ৪৩

১২। কবিতা—
অমলকৃষ্ণ গুপ্ত ৪৭

১৩। ভাগীরথী তটভূমি—
রবীন্দ্রমোহন মজুমদার ৪৯

১৪। বিজয়া—
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ৫১

১৫। সমর্পণ—
শ্রীমানিক রায় ৫২

১৬। অতন্দ্রা—
পরেশ সোম ৫৩

বিষয় :— পৃষ্ঠা :—

কবিতা :—

১৭। প্রথমে ও শেষে—
মানিক বল ৫৪

১৮। আশ্বিনের সুর—
অসিতকুমার চক্রবর্ত্তী ৫৫

১৯। জিজ্ঞাসা—
সাধনা সেন গুপ্তা ৫৬

২০। ক'নে-দেখা-আলো—
পরেশনাথ ঘোষ ৫৭

২১। গল্পাত্মক—
অসিতকুমার ৫৯

২২। শিশিরালি ধরণীরে—
শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস ৬০

২৩। ভজন—
শ্রীশঙ্খচন্দ্র সরকার ৬২

২৪। রূপকথা—
শ্রীসুনীল কুমার নন্দী ৬২

২৫। সোনালী—
শ্রীনিরঞ্জন বিশ্বাস ৬১

২৬। ব্যাপার-ভুবন—
সুবল চৌধুরী ৬৩

প্রবন্ধ :—

২৭। আধুনিক শিক্ষা সমস্যা—
শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্ত্তী ৬৪

২৮। তুলসী তলার প্রদীপটী—
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী ৬৮

তরুণ সাহিত্যিক মহল :—

২৯। শেষ শিকার [গল্প]—
শ্রীহেমব্রত বাগচী ৭১

৩০। স্মরণ রাখো [কবিতা]—
শ্রীকিরণগোপাল দে সরকার ৭৪

৩১। তিতাবঁধে কিছুক্ষণ [কবিতা]—
যুগান্তর নন্দী ৭৫

৩২। শেষ দিনে [কবিতা]—
কমলা ভট্টাচার্য্য ৭৬

এবার পূজায়—

বালুরঘাট

প্রাচ্য শিল্প ভবন

নতুন আয়োজন

বিশেষ

প্রাচ্যশিল্প ভবন

বালুরঘাট : পশ্চিম দিনাজপুর।

গিনি সোনার গহনার একমাত্র পরিবেশক

—আমাদের বিশেষত্ব—

- খাঁটি গিনি সোনা
- আধুনিক ডিজাইন
- ব্যবহারে মজবুত

প্রত্যেক গহনায় গ্যারান্টি ষ্ট্যাম্প থাকে (W. R.)

CENTRAL LIBRARY

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
ত্বমেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

—"সমুদ্র যেমন নদী সকলের একমাত্র গম্যস্থান, রুচিভেদে সরল-কুটীল নানাপথগামী জনগণের তুমিও তদ্রূপ একমাত্র গম্য।"

শারদীয়া

ভারতবর্ষ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সম্পাদক—শ্রীরাধামোহন মহান্ত

সহ-সম্পাদক—শ্রীরমনীমোহন ঠাকুর

ষষ্ঠ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৬২ | প্রথম সংখ্যা।

নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

আগমনী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

এলো শারদীয় পূজা বাঙালীর ঘরে।
জাগে গগন, জাগে প্রাণ ঘুমন্ত কবরে
শিশিরে সুস্নিগ্ধ বন শ্যাম বসুন্ধরা
সোনার আলোকে দীপ্ত শতদলে ভরা
রমনীয় সরোবর ধীরের বাতাস
শেফালীর মৃদু গন্ধ নীলের আকাশে
খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ মেলে উত্তরীয়
রূপসীর দিকে দিকে ভরি রমনীয়
অমরাবতীর ছবি আগমনে তব
ধরা হোলো এ বসুধ দাও প্রাণ নব
ধমনীর রক্তস্রোতে কাঠ দাও গান
হৃদয়ে সাহস দাও করো মা প্রেমোন্মাদ
জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতি দাও, দাও দাও
ভক্তির অমৃতধারা পিয়াও, পিয়াও

আয়াহি বরদে দেবি

শ্রীসীতেশচন্দ্র রায়, সাহিত্যভূষণ কাব্যপুরাণরত্ন।

"কত যুগ সাধনায় পর,—
অঞ্জলি ভরিয়া আনি
নীলপদ্ম দিনু তুলি
চরণ—উপর।
জাগো, জাগো, দেবি, জাগো,
মহিষমর্দ্দিনী মাগো,
জননী আমার—।"

অসি-পাশ-মেখলা রত্নোজ্জ্বল-কিরীটিনী-শোভিতা মা আনন্দময়ি! এস। তোমার আগমনের সাড়া পাইয়া পুণ্য বঙ্গভূমি আবার মাতিয়া উঠিয়াছে। বঙ্গজননী বর্ষাব্যাপী দুঃখ দৈন্য ভুলিয়া তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় আজ উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। তুমি আসিতেছ এই আনন্দে দিগ্বধূগণ শারদ-শুভ্র-জ্যোস্না কিরণে স্নান করিয়াছে। দিগ্বধূগণের এমন্বিধ উল্লাস দর্শনে ঈর্ষাভরে নীলপদ্ম তোমার শ্রীচরণ-কমলে আত্ম নিবেদন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইবার জন্য প্রাণভরা হাসির উৎস ঢালিয়া দিয়াছে। এস মা, বাঙ্গালীর প্রাণ শোক-সন্তপ্ত হইলেও সত্যই আজি তাহার বড়ই আনন্দের দিন।

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মার্ত্তজগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥ —চণ্ডী

হে শরণাগত দুঃখ হরে দেবি। প্রসন্না হও; হে অখিল জগতের জননী! প্রসন্না হও, হে বিশ্বেশ্বরী! তুমি বিশ্বকে রক্ষা কর; হে দেবী! তুমি এই চরাচর বিশ্বের ঈশ্বরী। মা! আজ এই দ্বিধা বিভক্ত বঙ্গে আবার শান্তি ফিরাইয়া আনো। কালের কুটিল ঘূর্ণাবর্ত্তে আজ তোমার সন্তানগণ নিপতিত। অনাচার অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতা স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতেছে। শক্তিমানের অপরাধের নিকট তীব্র প্রতিবাদও ক্ষুণ্ণ হইতেছে। প্রতিকার নাই। কিন্তু হে জননী! তুমি ত বিশ্বপালিকা। তুমি যেখানে রাক্ষসগণ, যেখানে উগ্র বিষসর্প, যেখানে শত্রুবর্গ, যেখানে দস্যুদল, যেখানে দাবানল ও যেখানে সমুদ্র, সেইখানেই তুমি ত বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ।

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধি মধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥ —চণ্ডী

এস মা। সেই বরাভয় মূর্ত্তি ধরিয়া শত্রুবর্গ, দস্যু-দল এবং দাবানল দমন করিবার জন্য—তোমার শরণাগত সন্তানগণের রক্ষার্থ।

মাকে দেখিলেই সন্তানের সকল কথা ফুটিয়া

শারদীয়া আত্রেয়ী

উঠে। সকল দুঃখকষ্ট ও অশান্তির কথা মাতার নিকট বলিয়া সন্তান তৃপ্তিলাভ করে। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে যখন ভবিষ্যৎ আচ্ছন্ন হয়, দুঃখ দৈন্যের দীন চাহনিটির ভিতর শুষ্ক ভ্রূকুটির ভঙ্গিমা-টুকু যখন বিদ্যুৎ প্রভার মত নিমেষের জন্য দৃষ্টি-পথে পতিত হয়, রোগে, শোকে জীর্ণতনু হইয়া সকল আশার জলাঞ্জলি দিয়া, নিষ্ফলকাম মানব যখন সংসারের অসারতা সর্বপ্রকারে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখন প্রাণের আবেগে আকুল হইয়া মর্মগ্রন্থির ভিতর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে 'মা' 'মা' বুলি উচ্চারণ করিয়া থাকে। তোমার সন্তানগণের আজ সেই অবস্থা—তাই আমাদের কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে 'এস মা'।

মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে জঠর বাসের নিদারুণ বেদনায় অধীর হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতাম। বাহ্য জগতের সংস্পর্শে ভূত-ধাত্রী ধরিত্রীর কোলে আশ্রয় পাইবামাত্র সদ্যোভূমিষ্ঠ আমরা 'উমা-উমা' রবে মহামন্ত্র মাতৃনাম গান করিয়াছিলাম। পরি-নত বয়সে শত কামনা কলুষময় হৃদয়ে তোমাকে আবার ডাকিতেছি 'মা'।

এস ভাই—কে আছ এস, উচ্চ, নীচ, মহৎ, অধম, ভক্ত, সাধু, পতিত, অন্ত্যজ, শবর, কিরাত, ম্লেচ্ছ যে যেখানে আছ এস। ঐ দেখ, এই শরতের নির্মল অঙ্গণে—আদ্যাশক্তি গিরিরাজ নন্দিনী সেই উমার ঐ বহুশোভমালা প্রতিমা—যিনি পাত্র নির্বিশেষে করুণা বিতরণ করিবার জন্য দশভূজা-রূপে মৃণ্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী মূর্তিতে অবতীর্ণা—যিনি 'সা বা এষা দেবতা দুর্নাম্-দূরং হ্যসা মৃত্যুঃ' এই শ্রুতিবাক্যে দুর্গানামের অধিকারিণী হইয়াছেন —যিনি দৈত্য—বিনাশ, বিঘ্ননাশ, রোগ পাপ ও ভয় দূরীকরণার্থ দুর্গা নাম গ্রহণ করিয়াছেন—

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ ॥
রেফো রোগঘ্ন বচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্ন-বচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিতঃ। —ঋগ্বেদ

এস ভাই, সেই মায়ের সন্তান আমরা বোধনের মন্ত্র পাঠ করি।

তস্মাদহং ত্বাং প্রতি বোধয়ামি
বিভূতি রাজ্য প্রতিপত্তি হেতোঃ।
যথৈব রামেন হতো দশাস্য—
স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি—॥ —মনুনিগদম্।

মা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার সন্তান. তুমি বিশ্বজননী। সমগ্র বিশ্বে বিশ্বের মানব সমাজে আমাদিগের ন্যায় নিরন্ন, দীন, হীন ও বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত আর্ত আর নাই। অনন্যোপায় হইয়া আজ আমরা তোমারই চরণে একান্ত শরণাগত। তুমি আমাদিগের দুঃখ দৈন্য দূর কর। আমাদিগকে মানুষ কর।

এস ভ্রাতৃবৃন্দ। আমাদিগের জীবনের শুভলগ্নে এই পুণ্য দিবসে চৈতন্য চন্দ্রের দেশে গৌরাঙ্গ, রাম-কৃষ্ণ, বিবেকানন্দের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পুনরায় দিব্য চৈতন্যের ও প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিয়া তাহার পূত সলিলে অবগাহণ করিয়া উচ্চ নীচের সকল ভেদ-বৈষম্য ভুলিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি করি ও জগজ্জননীর চরণে প্রণত হইয়া সমস্বরে যুক্ত করে বলি—

শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ—পরায়ণা।
সর্বস্যার্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে ॥—চণ্ডী

দার্শনিকের প্রেম

শ্রীকুমুদ চট্টোপাধ্যায়

[শোনা যায় 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-কার মধুসূদন সরস্বতীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা যাদবানন্দ প্রথমে সন্ন্যাসগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। কোন কারণে তাহা সম্ভব না হওয়ায় তিনি স্বগৃহে শাস্ত্রচর্চায় দিন কাটাইতেছিলেন। বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়ার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু সহসা এক অঘটন ঘটিল। তাঁহার গৃহ প্রাঙ্গণের বেড়ার গায়ে কতকগুলি পুষ্পলতা ছিল, এক বালিকা রোজ সেইখানে পুষ্পচয়নে আসিত। একদিন যাদবানন্দ তাহাকে ফুল তুলিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু বালিকা সে কথায় কান দিল না। দ্বিতীয়বার নিষেধ সত্ত্বেও সে নীরবে ফুল তুলিয়া যাইতে লাগিল। তখন তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য যাদবানন্দ বলিয়া ফেলিলেন—'আবার যদি ফুল তোল, তবে আমি তোমায় বিয়ে করব।' বালিকা একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, পরে ফিরিয়া আবার ফুল তুলিতে লাগিল। যাদবানন্দ আবার ঐ কথা উচ্চারণ করিলেন, বালিকা আবার চাহিল, আবারও ফুল তুলিল। তৃতীয়বার ঐ কঠিন কথা উচ্চারিত হইলেও বালিকাটি থামিল না, শুধু দেখা গেল তাহার মুখে একটুখানি মৃদু হাসি। বালিকার বৃদ্ধ পিতা নিকটেই বেড়ার ওপারে ছিলেন, সব শুনিয়া তিনি আসিয়া যাদবানন্দের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া যাদব তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। যাদবকে সংসারী হইতে হইল]

(১)

পৌষ পার্বণের দিন। সারা দুপুরটা মেঘলা করিয়া ছিল। সহসা অপরাহ্ণের দিকে প্রকৃতি খামখাই যেন আপন মনে হাসিয়া উঠিল। শীতে আরষ্ট হইয়া কমল লেপ মুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাতায়ন পথে বাহিরে চাহিয়া দেখিল, দূর শস্যক্ষেত্রে শীতের শেষ সম্ভারটুকু বৈকালি রোদে ঝলমল করিতেছে।

বিছানা ছাড়িয়া সে সোজা সুরমার ঘরের দিকে রওনা হইল। দরজাটা খোলাই আছে দেখিয়া বাহির হইতে ডাক দিল—"বৌদি!" সুরমা ঘর হইতে উত্তর দিল—"এস।" ঘরে ঢুকিয়া কমল দেখিল অরবিন্দু শুইয়া শুইয়া একখানি মোটা হাতের দেবনাগরি অক্ষরে লেখা জীর্ণ পুঁথি বুকের উপর ধরিয়া সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছে, আর সুরমা শিয়রে বসিয়া বোধ হয় উদ্দেশ্যহীন ভাবেই তাহার মাথার চুলগুলি একটি একটি করিয়া খুঁটিতেছে। কমল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাজ নেই বুঝি, তাই পণ্ডশ্রম করছ? নিশ্চয়ই এ-বয়সে দাদার চুল পাকে নি!"

পেকেছে কি না দেখছি, পেয়েছিও দুটো একটা। কেউ যদি অকালপক্ক হয়, তবে অসময়ে তার চুল পাকবে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?"

অরবিন্দু মুখ ফিরাইয়া তাকাইতে সুরমার চোখ হইতে একটা হাসির ঝলক তাহার চোখের উপর পড়িল। ফিরিয়া আবার পুঁথিখানির উপর মনোনিবেশ করিয়া সে শুধু একবার একটুখানি মৃদুহাসি হাসিল—তাহা কমলের দৃষ্টি এড়াইল না।

"বৌদি, জামাটা ত জোর করে' গা থেকে খুলে নিয়ে এলে, কেচে দিবে বলে'। এখন কি গায়ে দিয়ে বার হই বল ত!" —"রোদ্দুর ছিল না, নইলে শুকিয়ে যেত। ওর শার্টটা দিচ্ছি, আর তোমার গরম কোটটা ত রয়েছে।" —"না, গরম কোট আজ পরব না।" সুরমা আশ্চর্য হইয়া

CENTRAL LIBRARY
শারদীয়া আকেরী

বলিল—"সে কি ! এই তরা শীতে—ফিরতে ত রাত্তির হবে।" কমল আবার হাসিয়া উত্তর করিল—"শীতে আর রোদে মিলে আজ বেশ একটা অম্লমধুর স্বাদ হয়েছে, ওটা নষ্ট করতে চাইনে—তা-ছাড়া দুদিন বাদে ত সহরে ফিরে গরমের মধ্যেই পড়ছি ! দাদার শার্টটাই তুমি দাও—আজ সকাল-সকাল মনোজকে নিয়ে ফিরব।"

সুরমা মুহূর্ত্তের জন্য কুপিত হইয়া বলিল—"ছুটিটা ত বন্ধুর সঙ্গেই কাটালে ! রোজ-রোজ গিয়ে বুঝি তার কাছে ব্রহ্মচর্য শিখছ ? আমার প্রশ্নের জবাব দাও ত ! খুব না বড় গলায় লিখে ছিলে, কম করেও ডজন দুই জামা বানিয়ে নিয়ে তুমি বাড়ী আসবে, আমি যেন দেখেনিই। কই, তার কি হ'ল ?" —"ওখানে শীত নেই কি না, তাই ভুলেই গিয়েছিলাম বৌদি !" —বলিয়াই কমল জামাটি সুরমার হাত হইতে টানিয়া লইয়া পলাইয়া আসিল। নিজের ঘরের চৌকাটে পা দিয়া সে শুনিল অরবিন্দু বলিতেছে—"দর্জ্জিকে ডেকে বলে' দাও কমল রওনা হবার আগে যেন গোটা কয়েক জামা বানিয়ে রাখে।" উত্তরে সুরমার তিক্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"বলে' রাখছি ওরা ব্রহ্মচারী হ'বে, দুজনে মিলে তাম্রি কন্দি আঁটছে।" একটা স্থির শান্তস্বর বাতাসে ভাসিয়া আসিল—"কিছু কৃচ্ছ্র সাধনের অভ্যাস করছে এই ত ! তা মন্দ কি !" —কমল বুঝিল ইহার পর সুরমা আর ঘরে থাকিবে না, ছুটিয়া রান্না ঘরে যাইয়া কাঁদিতে অথবা রাঁধিতে বসিবে।

(২)

রান্না ঘরের সিঁড়ির নীচে জুতা জোড়া খুলিয়া রাখিবার সময় মনোজ শুনিল, ভিতরে তপ্ত খোলায় পড়িয়া কি একটা বস্তু ছ্যাঁক করিয়া উঠিল। উঠিয়া দুয়ারে আসিয়া সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সুরমা রন্ধনের দিকে উৎকণ্ঠিতা, বাঁ-হাতে দীপটি তুলিয়া ধরিয়া খোলায় ছাড়িয়া দেওয়া বস্তুটি ঝাঁঝা দিয়া টিপিয়া-টিপিয়া উল্টাইয়া দিতেছে। চারুগ্রীবা রাজহংসীর মতো উঁচু হইয়া সম্মুখে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। একটি সোনার সূক্ষ্মহার গ্রীবাটি আদরে জড়াইয়া ধরিয়া মৃদু দীপালোকে চিক-চিক করিতেছে। খোঁপাটি পরিপাটি করিয়া বাঁধা, দু-চারিটি কুঞ্চিত চিকণ কেশ কাণের ধার দিয়া দুটি কোমল চিবুকের স্পর্শ লাভ করিয়া আবেশে থরথর করিতেছে। পরণে ঘন-নীল বেনারসী, আঁচলটি বাঁ-দিকে ঘাড়ের উপরে তোলা—চক্‌চকে জরিদার পার পিঠের উপর দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। কাণের বহু মূল্য দুল মৃদু মৃদু দুলিতেছে। দুটি নগ্ন গৌর বাহুর উপর সোনার চিকণ আভরণ কোমল মাংস কাটিয়া বসিয়াছে। হাতের চুড়িগুলি দীপ প্রভায় থাকিয়া থাকিয়া চমক দিয়া উঠিতেছে।

"বৌদি !"

বাঁ-হাতে আঁচলের কোণাটি খোঁপার উপর তুলিয়া দিয়া সুরমা মুখ ফিরাইয়া তাকাইতেই তাহার চোখের পাতা দুটি শফরীর মতো নাচিয়া উঠিল। —"ঠাকুরপো যে ! এতকাল পরে ! তবু যা হোক মনে হ'ল ! তারপর বন্ধুটি কই ?"

"কমল অরু-দার ঘরে গেল—কথা আছে। কি করে' যে পারে ওখানে যেয়ে বসতে ! ঘর-ভরা অজস্র টীকা কালো-কালো দেবনাগরী চোখ মেলে টর-টর করে' চেয়ে থাকে—দেখে ভয় লাগে। শুকনো খসখসে মোটা কাগজের খর-খর শব্দে দাঁত শির-শির করে' ওঠে, আর কি বিশ্রী পচা পণ্ডিতি গন্ধ ঘরজুড়ে ! —না;, বৌদি ! আমি কিছুতেই ওখানে যেতে পারব না। তাই ছুটে এলাম তোমার ঘরে—এখানে তবু রস আছে, বাইরে থেকেই বেশ একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম। আজ পিঠে খাওয়ার দিন—ঠিক সময়েই এসে পড়েছি, কি বল ?"

"এস এস, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?" —ক্ষিপ্রগতিতে তাকের উপর হইতে একটি কার্পেটের আসন নামাইয়া লইয়া সুরমা মনোজকে বসিতে দিল। কড়াটি উনানের উপর হইতে নামাইয়া রাখিয়া ঘুরিয়া মনোজের মুখোমুখি বসিয়া

CENTRAL LIBRARY
শারদীয়া আত্রেয়ী

সে বলিল—"মিষ্টি খাবে বৈ কি, আজ খেতে হয় যে! রন্ধুটি ত ও ঘরেই রইলেন—তুমি বরং ছুটো একটা গরম-গরম এখুনি হাতে হাতে খেয়ে নাও! একটু বোসো না ভাই, আমি এক গেলাস জল ঢেলে আনি।"

সুরমা উঠিবার উপক্রম করিতে মনোজ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"থাক্-থাক্, ব্যস্ত হ'তে হবে না। যখন এসেছি, ছেড়ে কিছুতেই যাব না। এখন বল দেখি, আজ অকস্মাৎ এই বেশ-ভূষা কেন—বিশেষত রান্না-ঘরে?"

মৃদু হাসিয়া সুরমা উত্তর করিল—"বেশভূষা আর এমন কি দেখলে? শুনে ছিলাম তোমরা আসবে, তাই রাত হবে বলে' আগে থেকেই সেরে রেখেছি।" —কৌতুকভরে হাসিটিকে আরো মনোরম করিয়া বলিল—"আজ আমার শিবপূজো কি না! সেজে-গুজেই কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, নইলে ধ্যানভঙ্গ হবে কি করে', বল!"

মনোজ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল—"শিবপূজো? আমি ত জানি আজ ঘরে-ঘরে লক্ষ্মীপূজো! পাবণের দিনেও কি তুমি ঐ দেবীটিকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দেবে না? বেশ, তোমার খুশি। শিব ঠাকুরটি বুঝি ও-ঘরে বসে' টীকা লিখছেন? —কিন্তু ধ্যানভঙ্গের সাজ, এত হ'ল না বৌদি!"

"কেন, কিসের অভাব দেখলে বল!"

"অভাব নয়। তন্বী দেহলতা কিশলয়-শোভা ছেড়ে এ-বেশ ধরেছে কেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।" —সহসা রসনা হইতে এক কৃত্রিম কাব্যোচ্ছ্বাস নির্গলিত করিয়া মনোজ সুরমার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া বলিতে লাগিল—"কোথায় বসন্ত-পুষ্পের আভরণ? নীল অলকে তোমার কই নব কর্ণিকার? কোথা গেল অশোক-কুসুম আর সিন্ধুবার-ফুল মালা? পরণে কই রাঙা প্রভাতের অরুণ বসন? কোথায় বকুল-মেখলা, হাতে কই লীলা কমল? রক্তিম করে যে মন্দাকিনীর পদ্মবীজ-মালা উপহার দেবে, তা রেখেছ কি? —তা ছাড়া, বসন্ত যে আসেনি! কোন্ ভরসায় আজ কন্দর্প তার কার্মুক ধরে, মৃত্যুঞ্জয়ের বুকে পুষ্পবাণ লক্ষ্য করবে, বল দেখি?"

ছেলে মানুষের মতো খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল সুরমা। পরে তৃপ্ত কৌতুক চাপা দিয়া সে আশঙ্কার সুরে অভিনয় করিয়া বলিল—"মাগো! সেই ভ্রূ-ভঙ্গ আর তৃতীয় চক্ষুর অগ্নিজ্বালা! ও আই আমি চোখে দেখতে পারব না। থাক্, বেচারী কন্দর্পের আর ভস্ম হয়ে কাজ নেই। আমি ডাকিওনি তাকে, সখা বসন্তও তাই আসেনি। তোমার রূপ-সজ্জা ললিতবপু আর পুষ্পধনুর শর-সন্ধান ঐ দেবতার কাছে নিষ্ফল। ওঁর আবার ভয়ও আছে ষোল আনা। হয়তো রাগ করেই প্রমথগণকে নিয়ে স্ত্রী-সঙ্গ ছেড়ে অন্য কোথাও উধাও হয়ে যাবেন।"

"তবে সেজেগুজে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয় ধ্যান ভঙ্গ করতে, এ-কথাই বা বলছ কেন?"

"বনদেবীরা এত যত্ন করে' যে রূপে সাজালেন, চোখের আগে তার পরিণাম দেখে আর কোনো সখীকে ঐ রূপে সাজাবার মোহ তাঁদের ঘুচে গেছে। বেশছ না, আমি অন্য রূপে সেজেছি?"

"আজ নাইবা হ'ল মিষ্টিমুখ—তোমার মিষ্টি কথাই শুনব বৌদি। কিন্তু প্রশ্নটাকে তুমি এড়িয়ে গেলে। আমি যে রূপ-সাধনের কথা বলেছি তা যদি বিকল হয়ে থাকে, তবে এক অমোঘ সাধনাকে বাদ দিয়ে তুমি নব-রূপের উদ্ভাবনে ব্যস্ত হ'লে কেন?"

তটিনীর মতো কলতান তুলিয়া, চোখের পাতাদুটি আরো নাচাইয়া, ছন্দে-তালে অতিশুদ্ধ উচ্চারণে সুরমা বলিল—"প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।"

মনোজ এবার সত্যই বিস্মিত হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরে যখন বুদ্ধি জোগাইল, বেশ কৌতূহল ভরে সে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রিয়-জনের প্রীতি লাভের সৌভাগ্য যে এই রূপের হবে, তা তুমি কি করে' জানলে? এও ত ব্যর্থ হ'তে পারে!"

সুরমা হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর, যেন নিজেই নিজেকে আশ্বাস দিবার প্রয়োজনে, সে জোর করিয়া

শারদীয়া লাইব্রেরী

মাথা নাড়িয়া বলিল—"না. ব্যর্থ হবে না—আমি দেখেছি।"

"তারমানে, তোমার আরাধ্য দেবতার ধ্যান ভঙ্গ তুমি করেছ ? কঠোর তপস্যার আর প্রয়োজন নেই ?"

কণ্ঠের কাতরতা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায় মুখে হাসি ফুটাইয়া সুরমা বলিল—"না গো না—ধ্যান ভঙ্গ হয় নি ! তবে এই বেশে আমাকে ভাল লাগে—এক দিন বলেছিলেন, অনেক কাল আগে।"

বিপক্ষের শক্তি কতখানি তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া মনোজ তাহার শেষ অস্ত্র ছাড়িল—"বুঝেছি। শুধু ঐ টুকুর ওপরে ভরসা করে' তুমি মাস-বর্ষ-ঋতু তিথি নক্ষত্র দেখে ঐ বেশে বার-বার তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছ, আর তিনি ভ্রূক্ষেপ না করে' নির্বিকার চিত্তে ও-ঘরে বসে' অধোমুখে তাঁর চাকা লিখে চলেছেন দিনের পর দিন। বৌদি, সেই চতুর ব্রাহ্মণের কথা ভেবে দেখ ঃ কমণ্ডলু সকল জল-কলস আর পোষিত সিংহ গণ্ডারদের—এ ছলের ছলনের কোন আশা আছে কি ?

সুরমার মুখের চেহারা দেখিয়া মনোজ বুঝিল, অলক্ষিতে এক কোমল স্থানে ফুঁড়িয়া বসিয়াছে। ঠিক এই সময়ে কমল আসিয়া হাসি মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"উঃ ! বড় নীত, বৌদি !" অতএব সুরমা আর ভুবিল না, সহসা ভাসিয়া আসা একটা কাঠ হাতের কাছে পাইয়া ঐটিকে আশ্রয় করিয়া সে খুব অনায়াস সহিত তীরের দিকে সাঁতরাইয়া চলিল। মুখে চোখে এক আত্ম-গরিমার দৃপ্ত ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া সে কমলকে অভিযুক্ত করিয়া বলিল—"কেন, আমি বলিনি ?—সত্যি কথা কি না, তাই তখন ভাল লাগেনি। ওটার স্বাদ অমৃত নয় মধুরও নয়—বরাবরই তেতো"

"তুমি বুঝি, বৌদি, সত্যকে চেখে দেখেছ ? তার স্বাদ যে মিঠে নয়, তা তুমি জান ?"—তর্কের নেশা যেন মনোজকে পাইয়া বসিয়াছে। অজানিতে তাহার অন্তর আবার একটুখানি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কণা গায়ে না মাখিয়া সুরমা কিছু ক্ষুব্ধ স্বরেই বলিল—"ঠাকুরপো, এবার তোমার মিষ্টিমুখ করতে হবে।" বলিয়াই হাত বাড়াইয়া একখানি ছোট রেকাবি টানিয়া লইল। মনোজ হাত তুলিয়া নিষেধ করিয়া বলিল—'একটা গল্প শুনবে., বৌদি ?'

হাতের রেকাবি হাতেই রহিল। সুরমা আগ্রহে বলিয়া উঠিল—"বল না ভাই ! তোমার গল্প শুনতে খুব ভাল লাগে। কতদিন আসনি, তোমার গল্প শোনাও হয় নি।"

"তবে শোন এক অদ্ভুত সাপের কথা। ঐ সাপ থাকে ব্রাজিল দেশে। নাম হেওয়া যেতে পারে—অজগর। বড় বড় ষাঁড়কে পেঁচিয়ে ধরে' সে পিষে মারে।"

সুরমা ছেলে মানুষের মতো রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিল। "মনে কর তার ক্ষিদে পেয়েছে। গাছের গোড়ায় লেজটি পেঁচিয়ে রেখে চুপটি মেরে সে শুয়ে আছে। ষাঁড়টি চরতে চরতে নিশ্চিন্ত মনে কাছে এল।"

"তারপর...?"

"সাপটি আচমকা তার পিঠের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে' মাথাটি পেটের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে তাকে পেঁচিয়ে ধরলে। তখন কি হ'ল বল দেখি ?"

"কেন, ষাঁড়টি সাপকে নিয়েই দৌড় দিলে !"

"তুমি ভারি বোকা ত ! লেজটি যে গাছের গোড়ায় প্যাঁচানো আছে !—হ্যাঁ, ষাঁড় দৌড় দিলে বটে। কিন্তু তাতে করে' অজগরের প্যাঁচ তার গায়ে আরো শক্ত হয়ে কেটে বসল। তখন সাপ মাথাটি ঘুরিয়ে আর এক প্যাঁচে তাকে পেঁচিয়ে নিলে। ষাঁড়ের জিবটা তখন বেরিয়ে গেছে।"

"কি বিশ্রী গল্প তুমি বলছ, ঠাকুরপো !"

"তারপর আর একটি প্যাঁচ, বুঝলে ?—ষাঁড়টি শেষ হয়ে গেল।"

স্তম্ভিত হইয়া সুরমা মনোজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শান্তিনিকেতন আর্কাইভ

"এক প্রসিদ্ধ নাট্যকার মেয়েমানুষকে বলেছেন অজগর।"

"কেন, মেয়েমানুষ কি ব'ড়শি ধরে' খায়?

"না, তারা অমনি করে ধরে পুরুষকে।"

"সত্যই বিস্মিত হইয়া সুরমা বলিল—"এমন অদ্ভুত কথা ত কখনো শুনিনি!"

"তবে শোন, বলছি। প্রকৃতি চায় আরো ভাল মানুষ সৃষ্টি করতে।"

"কেন, এখনকার মানুষ কি ভাল নয়?"

"ভাল বই কি! তবে প্রকৃতির আর এই মানুষ ভাল লাগছে না। তাই সে বানাবে—অতি মানুষ।"

"কিন্তু মেয়েমানুষকে সে অজগর বানাবে কেন?"

"পুরুষকে বাঁধতে হবে পেঁচিয়ে ধরে। সৃষ্টির কাজে তার খেয়াল নেই।"

"বুঝেছি, তুমি কপিল মুনির কথা বলছ। তবে নাট্যকার বললে কেন? কই, কপিলমুনি ত মেয়েদের অজগর বলেন নি!"

"না, তিনি বলেন নি—তাঁর ভাষা সংস্কৃত কি না। যিনি বলেছেন, তাঁর ভাষা ইংরিজি।"

"তবু মেয়েমানুষ মেয়েমানুষই থাকবে। ইংরিজিও তাকে অজগর বানাতে পারবে না।"

"দেখ, পুরুষকে ধরে সৃষ্টির কাজ করিয়ে নিতে হবে। খুব কঠিন শিকারী চাই। অতএব অজগর তোমাদের হতেই হবে। খুব কষে একটা প্যাঁচ দিতে পারলেই—ব্যস, পুরুষের দফা রফা।"

"সুরমা হাসিয়া ফেলিল। "না, মোটে একটি প্যাঁচ কেন? প্রথমে ত দিবে ছুট—তখন আর একটি—জিব বেরিয়ে যাবে—তারপর আর একটি। কিন্তু তখন ত মরেই যাবে!"

"মরুক না—সৃষ্টির কাজেই ত মরবে! জীব-জগতে অনেকেই মরে। এক মহৎ কাজে পুরুষকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।"

এই উত্তরের জন্য সুরমা প্রস্তুত ছিল না। সে বিস্মিত হইয়া বলিল—"তাই কখনো হয়? —বল ত, তোমার সেই নাট্যকারের কাহিনী, শুনে দেখি!"

"আজ আর হয় না বৌদি। রাত হয়েছে—আর এক দিন..."

"বুঝেছি, নাট্যকার মোটেই ওকথা লেখেন নি। এতটা সময় শুধু বাজে কথা বলে' ভুলিয়ে রাখলে। মেয়েরা কেন যাবে স্বীকার করতে? ও ত পুরুষের কাজ। তীর-ধনুক হাতে তারাই ত এতকাল বনে-জঙ্গলে শিকার করে এসেছে।"

"আর ওদের শিকার করেছে মেয়েরা—তীর-ধনুক ছাড়াই।" —একটু মুচকি হাসিয়া মনোজ বলিল—"এই যে সেজেগুজে বসে' আছ বৌদি, আয়—খুঁটিয়া যাক কর—তোমার দেহে রয়েছে তন্বী বনলতার বিলাসভঙ্গী ও চোখে হরিণীর চকিত দৃষ্টি, সেই নাট্যকার তোমাকে দেখে বলবেন, তুমি বেরিয়েছ শিকারে—প্রকৃতির কাজ হাসিল করতে।"

সুরমা এবার সত্যই রাগ করিল। —"মিথ্যে কথা! একশোবার বলব—মিথ্যে। তুমি সব বানিয়ে বলছ—মোটেই তুমি সত্যি কথা বল না।"

"বৌদি, তেতো খেতে তোমার মোটেই ভাল লাগে না—এই হ'ল সত্যি কথা। শিবকে পেতে পার্বতী অর্থ-কাম ছেড়ে ধর্ম্মের পথ ধরেছিলেন। তোমার নাট্যকার যে স্ত্রী-ধর্ম্মের কথা বলেছেন, তুমি তাই একবার পালন করে' দেখ না! শিবেরে ধ্যানভঙ্গ হবেই।"

বুঝি সুরমার বুঝিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। সন্দেশ, পিঠে রান্নাঘর, কমল-মনোজ, কিছুই আর তাহার স্মৃতিপটে নাই। মনে পড়িল একজনকে—কমল ও মনোজকে আশ্চর্য করিয়া দিয়া সে সহসা ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৩)

"ও কি করছ, সুরমা! শাড়িখানা যে নষ্ট হয়ে গেল!"

"তাই বলে' তোমার লেখাটা নষ্ট হয়ে যাবে? এই দেখ, সব কালি শুষে নিয়েছে—অক্ষরগুলি সব স্পষ্ট দেখা যায়। কালির ধারা কেমন নাচতে-নাচতে লেখার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছিল, দেখনি? ভাগ্যিস আঁচল দিয়ে চেপে ধরেছিলাম!"

"সুরমা, এবার তবে যাও। মনোজ ও-ঘরে একা বসে' আছে। গল্প আমার মনে আসছে না—তারি কাছে গিয়ে শোন।"

"ঠাকুরপো ত বলে অজগরের গল্প—তাও আবার মিথ্যে করে' বানিয়ে বলে। মিথ্যে আমি মোটেই সইতে পারিনে। তুমি একটি সত্যি গল্প বল।"

"গল্প কখন সত্যি হয় না, মিথ্যে করেই বানাতে হয়। মনোজ কবিতা লেখে, তাই ভাল করে' বানিয়ে বলতে জানে।"

"উঁহু, মিথ্যে গল্প আমি কিছুতেই শুনব না। তুমি বলবে না একটি সত্যি গল্প?—বেশ, আমি তবে বিছানায় একটুখানি গড়িয়ে নিই। তুমি লেখ। শরীরটা কেমন করছে!"

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে একটা গল্প। শোন—অনেক কাল আগে অতি সুন্দর তিন রাজপুত্র ছিল। একই স্থানে এক সঙ্গে বাস করত তারা, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারত না।" তাদের দুটির এখনো জন্ম হয়নি, আর একটি মায়ের পেটেও আসেনি।"

"তবে যে বললে..."

"কাহিনী শেষ হবার আগে কথা বলা দোষ। চুপ করে শোন। তারা যেমন দেখতে ছিল সুন্দর, তাদের স্বভাবও ছিল তেমনি ভাল। যে পুরীতে তারা বাস করত, তাও ছিল মনোহর। তবে কিনা, সেই পুরী কোথাও কোন কালেই নেই।"

"কেমন আজগুবি ঠেকছে!"

"অতি বিচিত্র সেই পুরীর শোভা। একদা রাজপুত্রগণ পুরীর বাইরে মৃগয়া করতে এসে আকাশে সুন্দর সুন্দর গাছ, আর তাতে ভাল ভাল পাকা ফল দেখে ভারি খুসি হ'ল। ঐ মনোহর পুরী এখনো হয়নি, তবে ভবিষ্যতে হবে। কিন্তু রাজপুত্রেরা এখনো সেখানে বাস করছে। সেই ভবিষ্যৎ পুরীতে তারা মৃগয়া করে পরম সুখে জীবন যাপন করে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কিছু নেই।"

"না, আরো আছে। একদিন আকাশের অরণ্যে এক সোনার হরিণ দেখে তার পেছু-পেছু ছুটে তারা এক সোনার রাজ্যে এল। সেখানে এক বকাসুর প্রতিদিন প্রজাদের মেরে ঐ সোনার রাজ্য ছারখার করে দিচ্ছিল। রাজপুত্রগণ সেই অসুরকে মেরে পরমরূপসী তিন রাজকন্যা ও অতুল সম্পদ নিয়ে আবার সেই ভবিষ্যৎ পুরীতে ফিরে এল। সেখানে এক সুখের রাজ্য গড়ে, শূন্যের উদ্যানে বসে পাকা পাকা ফল খেয়ে, তিন রাজকন্যাকে নিয়ে তারা পরমসুখে দিনাতিপাত করছে।"

'হ্যাঁ, তাই করছে বটে। তবে রাজকন্যাও নেই, আর সুখের রাজ্যও এখনো হয় নি।"

"উঁহু, আমার কাহিনীতে তারা হয়েছে। নইলে রাজপুত্রেরা সুখে বাস করছে কি করে।"

"তারা সুখে বাস করছে ভাবী রাজ্য ও ভবিষ্যৎ রাজকন্যাকে নিয়ে।"

"কিন্তু রাজ্য ও রাজকন্যা যদি ভবিষ্যতে না হয়?"

"তা ত হবেই না!"

"তোমার কাহিনী তবে ভুল—যত অসম্ভব কথা দিয়ে ভরা। তুমি, ঠাকুরপো, সবাই—আশ্চর্য, কেউ বলেনা সত্যকথা!

শারদীয়া আত্রেয়ী

অরবিন্দ একদৃষ্টে সুরমার করুণ মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল। মৃদু-দীপালোকিত গৃহের আধ-অন্ধকারে ঐ মুখখানা যেন এক হতাশা ছড়াইয়া দিয়াছে।

"সুরমা, তুমি ঠিকই বলেছ। শিশুকে ভুলিয়ে রাখার জন্ত ধাত্রী যে রূপকথা বলে, তার চেয়েও অসম্ভব এই কাহিনী।"

"তবে কেন তুমি ঐ রকমের অসম্ভব মিথ্যে কথা আমাকে বলছ?"

"শোন। আগে আমাদের দেশের পণ্ডিতরা লোক-শিক্ষার জন্ত এই কাহিনী বলতেন। তাই অসম্ভব হলেও কাহিনীটি একেবারে মিথ্যে নয়।"

"তা কি করে হবে? যা কখনো হয় না বা হতে পারেনা, তাইত অসম্ভব! অসম্ভব তবে মিথ্যা—কিছুই-না—"

"হ্যাঁ, মিথ্যা—কিছুই-না। তবু এক প্রকাণ্ড মিথ্যা কি জানি কেমন করে সত্য হয়ে গেছে। সুরমা, আমরা কেউ কোথাও নেই কখনোই, থাকতে পারি না, কিন্তু তবু এখন এখানে রয়েছি ঠিকই। শূন্যের পাকা ফল খেয়ে, বকাসুর মেরে রাজকন্যা ও অর্দ্ধেকরাজত্ব ভোগ করে, যা মোটেই নেই তাই নিয়ে চলছে আমাদের লোকযাত্রা—এই সংসার। চলছে অনাদিকাল থেকে।"

"পণ্ডিতরা বুঝি তাই বলেছেন? কিন্তু তুমি ত কোন দিন এ কথা আমাকে বলনি! আমি তোমার মুখে শুনতে চাই। বল—সংসার মিথ্যা?

"কি করে বলি যে সংসার মিথ্যা? তাকে আমি চোখে দেখি, কাণে শুনি, হাত দিয়ে ছুঁই, আমার সবকটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে এসে ধাক্কা দিয়ে সে জানিয়ে যায় যে সে আছে। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে সে থাকতে পারে না, তার থাকা উচিত নয়।—ওকি, সুরমা, তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

একটা পাথরের ন্যায় স্থির মূর্ত্তি স্তব্ধ বসিয়া রহিয়াছে—চোখের দৃষ্টিতে কোন ভাষা নাই। ঐ জড় মূর্ত্তির গভীর অভ্যন্তর থেকে গুটি কয়েক কথা ধীর-মন্থর স্বরে কণ্ঠের নালী দিয়া যেন অসাড়ে বাহির হইয়া আসিল।—"সংসার তবে মিথ্যা। এই প্রকাণ্ড মিথ্যাটা সত্য হয়ে রয়েছে অনাদি-কাল থেকে। কেন সত্য হল সংসার? থাকতে পারে না—থাকা উচিত নয়—তবু কেন সে থাকবে? খুব অন্যায় যে সে রয়েছে। কে তাকে থাকতে দিলে? কে করেছে এই অন্যায় কাজ?.."

অরবিন্দ দুখানি হাত সুরমার দুটি সুন্দর স্কন্ধের উপর স্থাপন করিল। সুরমার অসাড় মূর্ত্তিটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার দুই জ্যোতিষ্মান্ চোখের দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা যেন চেতনা লাভ করিয়া সুরমা বলিয়া উঠিল—"ও!" তারপর ঐ খানেই মেঝের উপর অরবিন্দের পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। তাড়া-তাড়ি মাথাটি নিজের হাঁটুর উপর তুলিয়া লইয়া অরবিন্দ এলাইয়া-পড়া ক্লান্ত দেহখানির দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিল।

"সুরমা!—শোন।"

"বল।"—চোখ না খুলিয়াই উত্তর করিল সুরমা।

"এক তর্কবাগীশের ছেলে ছিল।"

সুরমা চোখ মেলিয়া অরবিন্দের মুখের দিকে চাহিল।

"তর্কবাগীশের নিজের টোলে ন্যায়শাস্ত্রের সেরা ছাত্র। গ্রামের স্কুলেও পড়ত। যখন দশম শ্রেণীতে ছিল, শিক্ষকরা বলতেন—ভাষা ও গণিতে তার দ্বিতীয় নেই। মোটের উপর সে ছিল পড়াশুনায় বেশ মনোযোগী—তবে ছেলেটা কিছু দুষ্টু ছিল বটে, আর জমিদার বাড়ির দারোয়ানের কাছে কুস্তি শিখে শরীরটা মজবুত করেছিল. এজন্ত বুড়োরা খুব তুষ্ট ছিলেন না তার প্রতি। মেয়েরা স্নেহভরে তাকে দিয়ে ছুটো ফাই-ফরমাস খাটাতেন ও পুজো-পার্ব্বণে ডেকে এটা-ওটা খাইয়ে দিতেন। ঐ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে—স্ত্রী-বিয়োগের পর শিশু-কাল থেকে তাকে নিজে হাতে মানুষ করেছেন। মেয়েটি ছিল পরমা সুন্দরী।"

"আর ছেলেটি?"

"ছেলেটা খুব কুৎসিত ছিল। ব্রাহ্মণের বড় সাধ

মেয়েটি লেখাপড়া শেখে। পাঁজিপুঁথি দেখে দিনক্ষণ ঠিক করে তাকে ভর্ত্তি করে দিলেন কাব্যবিনোদের টোলে।"

"সব গ্রামেই তর্কবাগীশ আর কাব্যবিনোদ থাকে নাকি?"

"সবগ্রামে থাকে না, তবে ঐ গ্রামে ছিল। ব্রাহ্মণ নিজে পাক করতেন, মেয়েটি ঘরদোর লেপে বাসন মেজে ঘরে তুলত। কালে সে নিজেই বেশ রাঁধতে শিখল তখন বাবাকে রান্নাঘর থেকে ছুটি দিয়ে ঘরকন্নার কাজ নেয়ে অবসর মতো পড়াশুনায় মন দিত। বুড়োরা বলতেন—যা সরস্বতী কোন ভাগ্যবানের ঘরের লক্ষ্মী হবে।" মেয়েরা শুনে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত। তবে মেয়েটি সত্যিই খুবরূপসী ছিল।"

"আর ঐ ছেলেটা? সে ত খুব দুষ্ট ছিল—তাই বললে, না?"

"খুব না, তবে কিছু দুষ্টু ছিল বলেছি। একবার পরের পুকুরে একটা বড় মাছ ধরে' যখন বাড়ী ফিরছে, পুকুরের মালিক এসে গালমন্দ করে' মাছটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। ছেলেটা এক জঙ্গলে ঢুকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মাছের আঁশ ছাড়িয়ে, আঁশগুলি সব ঠোঙাতে করে' মালিককে গিয়ে উপহার দিয়ে এল। বললে—'যে মাছ মেরেছে, মাছটি হ'ল তার। মালিকের পাওনা যা, তা বোল আনাই রেখে গেলাম।' —তর্কবাগীশের কাঠের খড়ম সেদিন বেশ জোরেই পড়েছিল তার পিঠে।"

"ছেলেটি তবে সত্যিই ভাল ছিল না—লেখাপড়া ছেড়ে বুঝি মূর্খ হয়ে রইল।"

"হ্যাঁ। প্রবেশিকায় বৃত্তি পেয়ে ইংরেজি পড়া ছেড়ে দিলে। ভাবলে, পিতার কাছে ন্যায় শাস্ত্রটাই ভাল করে' শিখবে। বুদ্ধির দোষে মূর্খ হ'ল?"

"কেন, ন্যায়শাস্ত্রে যে পণ্ডিত হ'ল?"

"না, লোকে পণ্ডিত হয় ইংরেজি শিখে। তারপর শোন। গরীব ব্রাহ্মণের ইচ্ছা ছিল, মেয়েটি কিছু দর্শন শেখে। মেয়ে এখন বড় হয়েছে। ছেলেদের সঙ্গে তাকে টোলে পড়াবেন, এই প্রস্তাব নিয়ে তর্কবাগীশের কাছে যাবার দুঃসাহস তাঁর হয়নি। একদিন সেই ছেলেটির মার কাছে এসে বললেন—'বৌ ঠাকরুণ! ছেলেকে বলে' দিন না, আমার মেয়েকে একটু দর্শন শেখায়। একটা সম্পর্ক ত রয়েছেই—কোন দোষ হবে না। আপনার কি মত? 'হ্যাঁ, তা বই কি!' —বলে' মা ছেলেকে ডেকে বললেন—'ও খোকা। এদিকে আয় ত! মুখুজ্যে ঠাকুরপো কি বলছেন শোন্।' ছেলেটি শুনে' বললে—'আচ্ছা, শেখাব। আপনাদের পুকুরে মাছ ধরতে দেবেন ত?"

"উঃ! কি স্বার্থপর! আমি হ'লে কিছুতেই পড়তাম না তার কাছে।"

"ব্রাহ্মণ আহ্লাদে গদ্‌গদ হ'য়ে বললেন—'আমার ত বাপু মোটে এক আনা অংশ। শরিকরা যদি কিছু বলে, এই ভয়। আচ্ছা, তুমি আমার এক আনা মাছই মেরো, তারপর আমি দেখে নেব।' —সেইদিন দুপুরে এসে মেয়েটি ভয়ে-ভয়ে বিছানার এক কোণে দাঁড়িয়ে ছেলেটির মুখের দিকে বোকার মতো চেয়ে রইল। ছেলেটি তখন টীকা লিখছিল, মাথা না তুলেই বললে—'কি পড়ছ?' সে উত্তর করলে—'নৈষধ, কাদম্বরী আর সাহিত্যদর্পণের...'"

সুরমা উঠিয়া বসিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

ছেলেটি বললে—'রোজ এখানে এসে ভাষা পরিচ্ছেদের পাঁচটি শ্লোক মুখস্ত করে' কিছু কিছু মুক্তাবলী নিজে হাতে টুকে নেবে। কেমন, পারবে ত?' মেয়েটি খুসি হয়ে বললে—'পারব।'

সুরমা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। —"এত মিথ্যে কথা বলতে শিখেছ তুমি? ছেলেটি নাকি কুৎসিত, আর খুব খারাপ? কি সুন্দর ছিল দেখতে—আর কত ভাল!"

"হয় ত তাই ছিল। আমার সব কথা ভাল মনে নেই।" একখানা বৃহদারণ্যক তাকের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে মলাটের পরের পাতায় কলম ধরে' বললে—'তোমার ভাল নামটি যেন কি?' মেয়েটি উত্তর করলে—তাইত!

কিনাম বলেছিল মনে করতে পারছিনে।"

"বলেছিল—সুরমা দেবী। ঐ নাম বুঝি ভুলে গেছ? বুঝেছি, তুমি সত্যি কথা আর বলবে না।"

"না, বলব না। আর তুমিও তা শুনতে চেওনা।"

"কেন—কেন বলছ ও কথা?"

"আমরা যে কাহিনী বলছি।—এখানে সত্যের কোন কথা নেই।"

"তবে সত্যি কাহিনী বলছ কেন? এর একবর্ণও ত মিথ্যে নয়।"

"সত্যি বলেই যে বলছি, তা কিন্তু নয় সুরমা। মিথ্যে হলেও বলতে কোন বাধা নেই। হয়ত এক ছেলে ও এমনি এক মেয়ে ছিল কখনো কোন এক গ্রামে, আর তাদের জীবনে এই ঘটনা ঘটেছিল। অথবা তারা মোটেই ছিল না কোন দিন, আর এই ঘটনা একেবারেই ঘটেনি। আমাদের কাছে তারা এই পৃথিবীর যে-কোন এক ছেলে আর যে-কোন এক মেয়ে হলেই চলবে।"

"কিন্তু পৃথিবীর সব মেয়েই ত আর নৈষধ পড়ে না।"

"নাই বা পড়ল নৈষধ! বাইবেল পড়ে, পড়ে কোরাণ, নয় ত অন্য কিছু—কিম্বা কিছুই হয় ত পড়ে না। ঐ সব অবান্তর—কাহিনীর উপলক্ষ্য। আসল কথা, তারা যে কোন এক ছেলে আর যে কোন এক মেয়ে। কাহিনী যে বলবে, আর যে শুনবে, ঐ ছেলেমেয়ের আর কোন খোঁজ তারা চাইবে না।"

"তা সম্ভব শুধু তাদের পক্ষে, যারা ঐ ছেলেমেয়েকে চেনে না। কিন্তু যারা চেনে—?"

"তারা ভুলে যাবে। সুরমা, ঐ ছেলে যে আমি আর তুমিই সে মেয়ে, এ-কথা কিছুতেই তুমি মনে করতে পাবে না। তবেই আমি পারব খুসি হয়ে বলতে, আর তুমিও খুসি হবে শুনে। তখন সত্য কি মিথ্যা, ভাল কি মন্দ, কোন প্রশ্নই মনে উঠবে না।"

"বেশ ত!—মজা মন্দ নয়। আচ্ছা তাই তবে হোক। ঐ সুরমা আমি নই, তুমিও নও সেই ছেলে। তারপর কি, বল।"

"নাম লিখে বইখানি হাতে দিয়ে ছেলেটি বললে—'যখন সময় পাবে, বাড়িতে বসে' নিজে-নিজে বইখানি পড়বে।' মেয়েটি খুসি হয়ে বই হাতে করে' বিছানার এক কোণে গিয়ে বসতেই, তার আঁচল লেগে কালির দোয়াত উল্টে গেল। লেখার ওপরে কালি ফেলা বরাবর এই মেয়েটির অভ্যাস।"

"মিছে কথা। ছেলেটি বরাবর অসাবধান। যেখানে-সেখানে দোয়াত রাখে, যখন-তখন লেখে. কখনো কোন হুঁশ নেই।"

"একদিন এক হিতৈষী এসে মেয়ের বাবাকে বললে—' মুখুজ্যে, বুড়ো বয়সে তোমার আক্কেল কি! বারো বছরের মেয়েকে এক আঠারো বছরের ছোঁড়ার কাছে দুপুরে একা ঘরে পাঠিয়ে দাও! শুনেছি, ছেলেটার স্বভাব তত ভাল নয়।"

সুরমা রাগিয়া উঠিল।—"বড় কুচক্রী ঐ লোকটা, কেউ দেখতে পারত না..."

"মেয়েটির বাবা তাকে বলেছিলেন—' কিছু ভয় কোরোনা দাদা! ওদের ঘরের জানলা খোলাই থাকে, আমি এখানে বসেই দেখতে পাই—আমার কড়া নজর আছে।' তবু একদিন একটা ঘটনা সত্যিই ঘটে' গেল। কিন্তু সে কথা থাক—আজ কাহিনী এই পর্য্যন্ত।"

অরবিন্দের চোখে কৌতুকের হাসি। সুরমা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"না-না, আমি শুনব। বল, কি ঘটেছিল।"

"কি হবে শুনে?—সবই ত জানা কথা।"

"না, আমার কাছে সব অজানা ঠেকছে। কি করে জানব—আমি ত সেই সুরমা নই!"

"দেখ, যা ঘটেছিল তা খুব ঘেন্নার কথা—বললে দোষ হয়।"

"তা কেন! তুমি খুসি হয়ে বলবে, আমিও খুসি হব

শারদীয়া আত্রেয়ী

শুনে—এতে আবার ঘেন্না কি ? এখানে দোষ-গুণ ভাল-মন্দের কোন কথা নেই ।"

"সমাজে থাকলে দোষ-গুণের কথা ভাবতে হয় । নইলে বনে যেতে হয় যে !"

"বনে যায় ত ঋষিরা—সত্যকে জানতে । আমাদের সত্য-মিথ্যার কোন প্রশ্ন নেই—আমরা যে কাহিনী বলছি । এখানে এখন শুধু তুমি আর আমি—শ্রোতা ও বক্তা—আমাদের আবার সমাজ কি !"

"সুরমা, তোমায় বুঝি হল না—আর কবে হবে তাই ভাবছি । "

"কি করে' হবে, বল ! ইংরিজি শিখিনি ত ! হুঁ!! গা, আমায় একটু ইংরিজি শেখাবে ?"

"পড়াশুনায় তোমার মন নেই, কি করে শিখবে তা ?"

"বেশ যদি মন না দিই, শাস্তি দিও ।"

"হাশু পণ্ডিত বলতেন, অমনোযোগী ছাত্রকে ঘুষি মারতে হয় ।"

"মন না দিলে, তবে ত ! তখন ঘুষি মেরো—আমি রাজি ।"

"তা হয় না । পণ্ডিত মশায় বলতেন, মেয়েদের গায়ে হাত দিতে নেই ।"

অবাক হইয়া সুরমা বলিল—"'তা বলে' তুমি আবার গায়ে হাত দেবে না? সে কি কথা গো!—একশো বার দেবে আমার গায়ে হাত ··।"

"সেই ঘটনার কথা বলি । ছেলেটি খুব যত্ন করে এক ফুলের বাগান করেছিল—পড়ার ঘরের জানালার নীচেই একফালি জমিতে ঐ বাগান। একদিন সে অবাক হয়ে দেখলে, মেয়েটি গাছে গাছে ঘুরে মনের সাধে ফুলগুলি ছিঁড়ে নিয়ে হাতের সাজিটি ভরছে । জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে' সোজা গিয়ে সে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—'তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয় ! ফুল নিচ্ছ কার হুকুমে ? কথায় কাণ না দিয়ে মেয়েটি একটা বেলফুলের গুচ্ছ ধরে' টান দিলে । ছেলেটির হৃৎপিণ্ড যেন ছিঁড়ে গেল । রেগে লাল হয়ে সে বললে—'কি ! কথার উত্তর দিচ্ছনা যে !' মেয়েটি সোজা হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—'আমাদের নারায়ণ পুজোর পালা আজ থেকে । সারা গাঁয়ে ফুল নেই । পুজোর ফুল এ-মাসটা এখান থেকেই নিতে হবে'— 'তাই বলে' এমনি করে' ফুলগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাগানটি তুমি শেষ করবে ? ফুল নেবে ও বলনি কেন আগে ?'—'বলব আবার কি ! পুজোর ফুল যেখানে পাব, সেখান থেকেই নেব ।' আরো জ্বলে' উঠে ছেলেটি বললে—'যাও, পুজোর ফুল যেখানে পাও, সেখান থেকেই নাওগে—আমার ফুল আমি দেব না ।' মেয়েটি আগের মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—এটা ভগবানের রাজ্য, যেখানে যা-কিছু সবি তাঁর—ফুল আপনার হ'ল কি করে' ?' কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেটি বললে— 'দেখ, তুমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতে, তবে বলতাম বড় হয়ে তুমি ডাকাত হবে । কিন্তু সে কথা থাক্ । ভগবানের রাজ্য হ'ল বনে জঙ্গলে, এই বাগান আমার নিজস্ব, আমি কষ্ট করে' নিজে হাতে করেছি । এখানে আমার পূর্ণ রাজত্ব, আর কারো অধিকার আমি মানিনে ।' মেয়েটি তখন আরো উদ্ধত হয়ে উঠেছে, একটু কড়া স্বরেই বললে—'আপনি করেছেন বলেই যে এতে আপনার নিজ অধিকার, এ-কথা আপনি কোথা থেকে শিখেছেন ? শুনি নাকি দর্শনের ছাত্র, কিন্তু গীতাখানাও ত পড়া নেই !' কথাগুলি তীরের মতো ছেলেটির বুকে এসে বিঁধল, অতি কষ্টে ক্রোধ চেপে আরো লাল হয়ে বললে—হ্যাঁ, শকুনের যে দর্শন আছে একথা আমি জানতাম না, তাই না বুঝেই এই বাগানখানি করেছি—তোমাদের এখন চোখ পড়েছে এর ওপরে । কিন্তু শকুন কি বোঝে ফুলের মর্ম্ম ? তার স্থান এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোথায় ভাগাড় আছে দেখ ।' অপমানে মেয়েটির দুটি গাল জবা ফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠল । সাজি-ভরা ফুল ছেলেটির মুখের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে—'আজ তুলসীপাতা দিয়েই

শারদীয়া আত্রেয়ী

নারায়ণের পূজো হবে'—বলে' পেছন ফিরে সে বাড়ীমুখো হাঁটা দিলে। 'চল! তোমাকে চোরের মতো ধরে' নিয়ে গিয়ে কাকার কাছে হাজির করব, উনিই বিচার করবেন'—বলে' ছেলেটি ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে' ফেললে।"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুরমা জিজ্ঞাসা করিল—"পালাতে পারলে না, মেয়েটি?"

"এক হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি টাল সামলাতে না পেরে সমুখে এক কাঁটা ঝোপে হুমড়ি খেয়ে পড়ে' গেল!"

"কি দরকার ছিল হাত ছাড়াবার যদি ছাড়া পেয়ে টাল সামলাতেই না পারে? —বোকা মেয়ে!"

"ঠিক সেই সময়ে গাড়ু-গামছা হাতে শিবনাথ ভটচাজ পুকুরঘাট থেকে উঠছিলেন। তাঁকে দেখে ছেলেটি দ্রুত বেগে বাড়ীমুখো হাঁটা দিলে, বেড়ার ধারে একটা খাল ডিঙিয়ে পার হতে গিয়ে খালের মধ্যে পড়ে' সে পায়ে এক বিষম চোট খেলে। ভটচাজ্যি কিছুক্ষণ হাঁ করে' তাকিয়ে থেকে মেয়েটিকে বললেন—'কি হয়েছে, মা তোমার?' মেয়েটি তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠে—'কই, কি হয়েছে!' —বলে' সে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালে। ভটচাজ্যি একটুও না ঘমে' এগিয়ে এসে বললেন—'দেখি মা দেখি! মুখখানি তোল ত! যেন রক্ত পড়ছে বলে' মনে হয়।' মেয়েটি ক্রোধভরে এক ধাক্কা দিয়ে তাঁর প্রসারিত হাতখানা সরিয়ে দিয়ে হন হন করে' বাড়ীর দিকে চলে' গেল।"

"ছেলেটার দোষেই ত এই কেলেঙ্কারি হ'ল!"

"কিন্তু মেয়েটা যে চোর ছিল!"

"কক্ষণো না, দিনের আলোতে কেউ চুরি করতে যায় না।"

"তা হ'লে সে ডাকাত ছিল। দিন-দুপুরে ডাকাতি করতে বেরুত।"

"বেশ করত। দেবতার নামে দুটো ফুল দিতে যার প্রাণ চায় না, তার প্রাণের ধন লুটে নেওয়াই উচিত—দেবতা তাতে তুষ্ট হন।"

"কিন্তু লুটের ধন সবটাই পায় দেবতা, কিংবা যার ধন তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বাড়ীমুখো হাঁটতে হয়।"

"না, ফিরিয়ে দিয়ে কেন! —মুখের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে। তাও গিয়ে পড়ে দেবতার পায়েই।"

"লাভ দেখছি দেবতারই! যে লুট করলে, সে নিজে কি পেলে, তা ত বললে না!"

"ওমা! মানুষ আবার পাবে কি! পাওনা ত দেবতার! তুমি নাস্তিক, তাই এই সহজ কথাটি বোঝ না।"

অরবিন্দ হাসিয়া ফেলিল। —"ও! দেবতা বুঝি টাকা সুদে খাটান! তাঁর ঋণ শোধ করে' আর কিছুই থাকে না মানুষের—তার ভিটে মাটিও বুঝি উচ্ছন্ন যায়! কিসের দায়ে হয়েছিল মানুষের এত ঋণ?"

"কেন, দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করেছে তাঁর কৃপায়, সেই জন্যে!"

"ঠিক। যে জন্মে কেবল দেনা আছে, পাওনা নেই, তা দুর্লভ জন্মই বটে।"

"তুমি ঠাট্টা করছ!"

"না-না, সেই কাহিনীটা বলি শোন। সেদিন সন্ধ্যায় জমিদার বাড়ীর বৈঠকখানায় শিবনাথ ভটচাজ ঘটনার এক মুখরোচক বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করলেন—'আমি নিজ চোখে মেয়েটির গালে সদ্যোজাত ক্ষতচিহ্ন দেখেছি।' উপস্থিত ভোটগণ দিক্ দিক্ করে' উঠলেন। স্মৃতিতীর্থ লাফিয়ে উঠে বললেন—'এর প্রতিবিধান চাই।' বাঁড়ুজ্যে খেঁকিয়ে উঠে বললেন—'চাই ত বলছ! ভারশাস্ত্রের প্রমাণতত্ত্ব জানা আছে? ছেলের দাঁতের ধার দেখলেই শুধু চলে না, তর্কবাগীশের তর্কের ধার কত তাও জানা থাকা চাই।' স্মৃতিতীর্থ চীৎকার করে' উঠলেন—'তাই বলে' সমাজের বুকের ওপরে এই অনাচার—তার কোন প্রতিকার নেই?' অনেকের মত হ'ল—'আচ্ছা. ডাক দেখি মুখুজ্যেকে, সে কি বলে

শারদীয়া আত্রেয়ী

শুনি।'"

"সবাই মিলে ছেলেটিকে শাস্তি দিলে?"

"না, শাস্তি দিলে মেয়ের বাবাকে। পরদিন প্রভাতে তিনি তর্কবাগীশের কাছে ছুটে এসে তাঁর দুটি পায়ে মাথা ঠুকে বললেন—'দাদা, দরিদ্রকে রক্ষা করুন।' সব কথা শুনে তর্কবাগীশ হুঙ্কার দিয়ে পুত্রকে তলব করলেন। ছেলেটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাছে এসে মাথা নীচু করে' দাঁড়াল—চোখ দুটি তার লাল। পিতা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—'তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলাম। আজই আমার সম্মুখ থেকে দূর হও।' গরীব ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'দাদা, এই কি তোমার বিচার হ'ল? ছেলেকে ছেড়ে দিলে, বিশাল ভারত ঘুরে সে চরে' খাবে। আমি আমার মেয়েটির কি করব, কই, তার বিধান ত দিলে না!' ছেলেটির মা এসে বললেন—'হ্যাঁ গা, কিছু জানলে না, শুনলে না, লোকের কথায় ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করলে? জ্বরে মাথা তুলতে পারছে না রাত থেকে; তোমার হুকুমে উঠে এসে দাঁড়াল, আর তুমি তাকে ঐ নিষ্ঠুর কথাটি শুনিয়ে দিলে? কি কঠিন প্রাণ তোমার! এত বড় পণ্ডিত তুমি, তোমার বিধান খণ্ডাতে পারে এমন পণ্ডিত বাংলায় নেই, আর এই সামান্য ব্যাপারটির তুমি কোন মীমাংসা খুঁজে পেলে না? —মেয়েটি বড় লক্ষ্মী, আমি ওকে ঘরের বউ করব। দাও ওদের হাতে হাত মিলিয়ে, দেখি গ্রামের লোকে কি করে!'"

সুরমা বলিল—"ঠিকই ত, শাস্তি হওয়া উচিত ছেলেটির—সেই ত দোষ করেছিল। ত্যাজ্যপুত্র হ'লে মোটেই শাস্তি হ'ত না তার—মনের আনন্দে শুধু ঘুরে বেড়াত।" —তাহার মুখে চাপা হাসি।

"তর্কবাগীশ গম্ভীর হয়ে চিন্তা করে' বললেন—'তবে তাই হোক। মুখুজ্যে, তুমি জোগাড় করগে যাও।' গ্রামের লোক বিয়েতে কেউ এল না। পঞ্চগ্রামের লোক ডেকে, বাংলা দেশের বড় বড় পণ্ডিতকে এনে, সবাইকে পেট পুরে খাইয়ে ও উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে, মহা ধুমধামে তর্কবাগীশ তাঁর ছেলের বিয়ে দিলেন। তিন দিন ধরে' নহবতের আলাপ গ্রামের লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে চারদিকে শুধু ঢেঁড়ে ছড়াতে লাগল।"

সুরমার চোখে স্বপ্নের ঘোর লাগিয়াছে। সে আপন মনেই বলিয়া গেল—"বিয়ের রাতে কি-একটা সুর ইনিয়ে-বিনিয়ে যেন রূপকথা বলে' মেয়েটিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। ভোরে ঘুম থেকে জেগে সে শুনলে আর একটা সুর তাকে ডাক দিয়ে বলছে—'দেখ-দেখ, কত আলো—কত গান—কত কথা—কত হেসে হেসে চলা—আর কি সুন্দর নীল আকাশ!'"

অরবিন্দ মুগ্ধ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুরমা আজ বড়ই মুখরা হইয়া উঠিয়াছে। —"কদিন পরেই ছেলেটি বেদান্ত পড়বে বলে' পিতার অনুমতি নিয়ে রওনা হ'ল মহারাষ্ট্রে। সেদিন সন্ধ্যায় তর্কবাগীশ ভেতরে এসে বললেন—'এ-বিয়েতে বোধ হয় ছেলের মত ছিল না। বিয়ের পর থেকে বড় গম্ভীর দেখেছি।' —মেয়েটি ছুটে গিয়ে ঠাকুর ঘরে শিবের কাছে বসে' কল্পনাকে ছেড়ে দিলে দূরে—হিমালয়ের দিকে। স্পষ্ট দেখলে, এক দৈত্যের মতন জটাধারী দণ্ডী বরফের স্তূপ ভেঙে ওপরে উঠছেন। কি সে চেষ্টা ওপরে ওঠার! শিখরে উঠে পা বাড়িয়ে পাহাড়ের ঐ দিকে নেমে তিনি সন্ধ্যার আকাশে সূর্যের মত ডুবে গেলেন। একবার ক্ষণেকের জন্যও এই ছেড়ে-যাওয়া পৃথিবীর দিকে পেছন ফিরে তাকালেন না।"

অরবিন্দ শুনিতেছে, কি কেবল তাকাইয়া রহিয়াছে, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা কঠিন। সুরমা বলিয়া চলিল—"সারা রাত স্বপ্ন দেখে পরদিন প্রাতে বাইরে তাকিয়ে মেয়েটির মনে হ'ল—'কই আলো, কই গান! লোকে হাসে কই—কেবলি ত কাঁদে দেখি! আর আকাশ মোটেই নীল নয়!' ...সত্যিই, মেয়েটি বড় দুঃখী!"

অরবিন্দের চমক ভাঙিল। সুরমার কাতর মুখখানি

শারদীয়া আত্রেয়ী

তুলিয়া ধরিয়া বেশ কিছু আবেগ ভরেই সে বলিল—"সত্যিই দুঃখী সে—খুব দুঃখী। তবু মনে রেখো সুরমা, আমরা কাহিনী বলছি। ঐ মেয়ে তুমি নও—সবাই ঐ মেয়ে। পৃথিবীর যেখানে যত মেয়ে আছে দুঃখী, আমরা সবাইকে দেখছি। এস, এই দুঃখ নিয়ে—পৃথিবীর এই শোক নিয়ে—আমরা তৈরী করি কাহিনী, খুব সুন্দর করে'। তুমি ত জান, সুন্দর হয় শোক—দুঃখ হয় মধুর। যেমন হয়েছিল ক্রৌঞ্চশোক, বাল্মীকির মনে—যে শোক তাঁর ভরাবুক থেকে উচ্ছলিত হয়ে পড়েছিল!"

মেঘ সরিয়া গেলে যেমন রোদে হাসিয়া ওঠে পৃথিবী, ঠিক তেমনি করিয়া সুরমার মুখখানি সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল। —"সত্যিই মেয়েটির দুঃখ খুব সুন্দর হয়, যদি এমনি করে' বসে' বসে' তুমি তার কাহিনী রচনা করে'-বলে' যাও। বলবে?"

"তাই ত বলছি, সুরমা! আরো বলব।" অতি সহজেই বলিয়া ফেলিল অরবিন্দ, যেন বলিতে কোন দুঃখ নাই—"আজ থেকে পুঁথিপত্র সব বন্ধ থাক্! এস, তুমি আর আমি-একসঙ্গে—এমনি করে' এখানে বসে' দুজনে কেবলি কথা বলে' যাই"...

সুরমা চমকিয়া উঠিল, সহসা কি-কথা তাহার মনের কোণে উঁকি দিয়া গেল। অন্যমনেই সে দোয়াতটি কাছে টানিয়া লইল, ডান হাতে কলম লইয়া, বাঁ-হাতে অরবিন্দের অর্ধেক-লেখা পাতাখানি তুলিয়া লইয়া হাঁটুর উপরে রাখিয়া দিল। কিছুই করিল না, কেবল ঐ ভাবে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বোধ হয় সুরমা ভাবিতেছে—মেয়েটির দুঃখ দিয়া যদি কাহিনী রচনা করে অরবিন্দ, ছেলেটির দুঃখের গান তবে গাহিবে কে? নাই কি কোন কবি, যে ঐ সঙ্গীত গায়? —কাজ নাই তবে গানে, থাক্ কবিতা..

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া সুরমা কলমটি কালির দোয়াতে ডুবাইল। —"তোমার হাতের কাজটা আগে সারা হোক, তারপর শুরু হবে আমাদের কাহিনী। দেখি টীকাখানা, আমি কিছু লিখে দিই। রোজ লিখব, যখনই সময় পাব।".....

অরবিন্দের চোখে ফুটিয়াছে অতীন্দ্রিয় রাগ—বুদ্ধির মর্মভেদী তীব্র জ্যোতিঃ আর নাই। সুরমার হাতখানি সে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"ওটা এখন রেখে দাও সুরমা। আজকের এই রাতখানি, এস, আমরা আমাদের খুসি দিয়ে ভরে' দিই।"

"তবে বল সেই ক্রৌঞ্চশোকের কথা। কোথা থেকে এল—কেন এল—ঐ নিষ্ঠুর ব্যাধ ওদের মিলনের মাঝখানে? কেন সে হানলে তার কঠিন বাণ আনন্দের বুকে? বল-বল, বলবে না তুমি?" —যেন কথা বলিতে বলিতেই সুরমার চোখে এক উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। অরবিন্দ তাহার লঘু দেহলতা বাহুবেষ্টিত করিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইল। পিছু হেলিয়া সুরমা মাথাটি অরবিন্দের বুকের উপর রাখিল, তাহার খোঁপায় ছিল জুঁই ফুলের মালা—অরবিন্দের নাকের ঠিক নীচে।

"বলব বই কি! সুরমা তুমি কাতর হোয়ো না। দুঃখকে আমরা সুন্দর করে' দেখব—ঐ ব্যাধকেও আমাদের ভাল লাগবে। ক্রৌঞ্চের মৃত্যু, ক্রৌঞ্চীর ক্রন্দন—তাদের বিচ্ছেদ ঐ নিষাদের তীরের ফলায় ছিল না, ছিল ওদের জন্মে—ঐ মিলন তাদের প্রাপ্য নয়। সংসার কিছুতেই সইবে না তাদের সুখ। সেই সুখকে মুহূর্তেই শেষ করে' দিয়ে ব্যাধ করেছে সংসারের নিজের কাজ। ও কি সুরমা! ঘুমিয়ে পড়ছ? —জাগ, জাগ! জেগে জেগে শুনতে হয় এই কাহিনী, চোখ মেলে দেখতে হয় এর সৌন্দর্য্য। শোক যদি সুন্দর হয়, তবে যে নিষ্ঠুরতা এনে দিলে ঐ শোককে, সেই বা কেন অসুন্দর হবে। রাবণের স্থায় পাষণ্ডের সৃষ্টিতেও বাল্মীকির ছিল আনন্দ। ঐ পাষণ্ডকে বাদ দিলে আর দুঃখ নেই, দুঃখের আনন্দ নেই, নেই বিচ্ছেদ, অশোক বনে নেই সীতার ক্রন্দন, নেই তার পাতাল প্রবেশ, প্রেমের সিংহাসনে নেই তার স্থানটি চির-

শারদীয়া আত্রেয়ী

দিনের মতো খালি হয়ে থাকা—নেই রামায়ণের গান। রাবণ—নিষাদ—ওরাই জানিয়ে দিলে মানুষকে তার আপন অদৃষ্ট, তার এই দুর্লভ জন্মের অনিবার্য শোক, তার প্রেমের বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে যে মৃত্যুবাণ।...সুরমা চোখে আঁচল দিলে? কাঁদছ বুঝি? কেঁদনা—তুমিই না বলেছিলে মানুষের কিছু পাওনা নেই, দিতে হবে শুধু দেবতাকে? তাই দাওনা, তারি ক্ষুধা মেটাও! আহুতি দাও নিজেকে—শেষ কর তোমার ভালবাসার কামনা—চুকিয়ে দাও এই সংসারের সুখের আশা"...

আধ-ঘুমঘোরে সুরমা জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর!"

"তারপর আর কিছু নেই, এই খানেই আমাদের কাহিনীর শেষ।"

সুরমা উঠিয়া স্বামীর কোল হইতে নামিয়া বসিল। তাহার চোখে তখন আকাশের ওপার-থেকে-আসা এক অতিদূর নক্ষত্রের আলো।—"না, আরো আছে। সব চুকিয়ে দেওয়ার—সব-হারাণোর আনন্দে আমার প্রতিষ্ঠা হবে, তুমি শুরু কর সেই কাহিনী। আমি কেন হারিয়ে যাব?—বল, বল—মনে পড়ছে না? তবে আমি বলি শোন। অনেক দিন আগের কথা। এক 'ঋষি চলেছেন বনে। ঘর-বাড়ি ধন দৌলত, প্রচুর ঐশ্বর্য্য—এক কথায় সংসারের সব সুখ—তাঁর স্ত্রীর হাতে তিনি দিলেন। কিন্তু সব ফেলে দিয়ে স্ত্রী তাঁর পেছু ধরে' বললে—'দেখ, আমি মরতে চাইনা, তবু আমাকে মৃত্যুর মুখে রেখে তুমি চলেছ—বোধ হয় অমরত্বের খোঁজে। তুমি জান জীবনের সন্ধান :— কিসে আমি হব অমৃতা, কই, সে-কথা আমরা বলে গেলে না ত! "ঋষির বুকে আলোড়িত হ'ল বহুদিনের প্রেম, বুঝি চোখ দুটিও আনন্দে ভিজে উঠল। তিনি বললেন—মৈত্রেয়ী, প্রিয়তমা...' ওগো, কি বললেন, বল না! তোমার কাহিনী তুমিই শেষ কর"...

ঘরের বাহিরে বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে মনোজ—কতক্ষণ, কেহ জানে না। সহসা সিঁড়ির কাছে চটির শব্দ শুনিয়া সে তাকাইয়া দেখিল—কমল। হাত তুলিয়া ইশারায় বলিল—চুপ! কাছে আসিলে কমলের কাণে কাণে বলিল—"দুটি দেব-দেবী স্বর্গ থেকে নেমে এসে ঐ ঘরে বসে খেলা করছে। এই দৃশ্য দেখবার অধিকার মর্ত্তের মানুষের নেই। তবু দেখছি, ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে—চলে যাবার শক্তি নেই। শোন..."

"মৈত্রেয়ী, তুমি আমার চিরদিনের প্রিয়া, আজ আমার প্রিয় কথাই বলিতেছ। এস, এস, কাছে ব'স। যে কথা শুনিতে চাও, আমি তোমায় সেই কথা শুনাইব। তুমি শোন—তাব..."

"ওগো শোন। পতির জন্য পতি প্রিয় নয়—প্রিয় হয় সে আমার জন্য। জায়ার জন্য জায়া প্রিয় নয়—প্রিয় সে আমার নিজের জন্য"..

"সকল বস্তু আমি ভালবাসি শুধু আমার জন্য··আমি সেই নিখিল বস্তু"...

"শত আঘাতের শত শব্দে বাজে দুন্দুভি, কত শঙ্খের বীচিমালায় শঙ্খধ্বনি ওঠে! বীণ যখন বাজে, তার ঝঙ্কারেই শোন তুমি তার শত লক্ষ সুর। সেই ধ্বনি, সেই বাদ্য, শত সুরের সমাহার সেই ঝঙ্কার ওঠে আমাতে—আমার বাহিরে কোন সুর নাই, শব্দ নাই"...

"এই লোক, পরলোক...সকল বিদ্যা, সকল জগৎ··· যাহা কিছু-আছে যেখানে সকলই আমার নিঃশ্বাস—আমি সকলের প্রাণ।...ওগো প্রিয়া, আমি ছোট নই—আমি অনন্ত—আমি অপার"···

"আমি সচ্চিৎ, আমি সুখ···"

"প্রেয়সী, এই কথাই আমি শুনাইতে চাই—এই সত্য"...

"ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীমি"···

মালয় কন্যার কাহিনী

—সুবাষ সমাজদার

অফুল আকাশতলা জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। রাত্রির নিস্তব্ধতায় তলিয়ে গেছে উল্টাডিঙ্গির নিবারণ দাস লেন। গলিটার একেবারে শেষপ্রান্তে ইট ওঠা, রঙচটা জরাজীর্ণ দোতালা দালানটা আবছা আলো অন্ধকার গায়ে মেখে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়ীরই ছাদের এক কোণে অন্ধকারের ভিতর থেকে থেকে জ্বলে উঠছে একটা আগুনের ফুলকি। বেড়ালের চোখ? না। সিগারেট ফুঁকছে একতালার ভাড়াটে নীল বুল সার্ট পরা ছোকরা সুররাজ। একটা খুব জোর সুখটান দিয়ে সে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। হাত দুটো পেছনে নিয়ে অস্থির পায়ে পায়চারী করতে সুরু করল। মুখ উঁচু হয়ে ওঠা জুতোর পেরেকের মত নিদারুণ একটা অস্বস্তি ক্রমে বিকৃত করে দিচ্ছে তার মন। আজ কি হলো ওর? ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা ব্যাথা ধরে গেল। ও আসছে না কেন? হঠাৎ ছাদের এক কোন থেকে একটা রাতজাগা বোকা টিয়নী কেটে উঠল চির-চির-চির সঙ্গে সঙ্গে সুররাজের নাকে এসে ধাক্কা দিল রাত্রির বাতাসের সঙ্গে মিশে গন্ধ তেল মাখা চুলের মিষ্টি ভুরভুরে একটা সুগন্ধি। উঁহু উঁহু গন্ধটা লক্ষ্মীবিলাস, লক্ষ্মীবিলাস মনে হচ্ছে। না, না, সে তো লক্ষ্মীবিলাস কি অবাঙালীর মাথে না, সে যে মাখে ক্যালি-ফর্ণিয়ান পপি! —সত্যি! বড্ড দেরী হয়ে গেল। তুমি কিছু মনে করো না সুররাজ—ভালিমের দানার মত ঠোঁটের কোনায় নির্ভাজ একটা হাসি ফুটিয়ে মিহি গলায় বলল নীলা। —যাক, তবু ভাল তুমি এসেছ। আমি তো ভেবেছিলাম আসতেই পারলে না বুঝি—কোহামাখা চোখে তার দিকে তাকালো সুররাজ। কী আশ্চর্য ওর রূপ। বাঙালী। কিন্তু বাঙলা দেশের নরম মাটির মেয়ে ও নয়। ওর গায়ের রঙে বরফ ঢাকা হিমালয়ের শ্বেত শুভ্রতা। বড় বড় দুটো টানা চোখে ভারত মহাসাগরের নীলিমা। মালয় দ্বীপে বড় হয়েছে নীলা। রাত্রির শন শন করা হাওয়ায় উড়ছে ওর রব করা রেশমের মত চুলের রাশ; উড়ছে পত পত করে ওর পরনের গোলাপী সালোয়ার। ছাদের তরল অন্ধকারে হপ করে জ্বলে উঠল সিগারেটের লাইটার। সিগারেটে খুব জোর একটা টান দিয়ে নীলা বলল—আজকে দমদমে গিয়েছিলে সুররাজ? তোমার গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং-য়ের এ্যাপ্রেন্টিস শিপ পিরিয়ড শেষ হতে আর কতদিন বাকী আছে? —এখনো দেড় বছর। জানো, নীলা আজকে একটা নতুন জিনিষ শিখলাম। এতদিন আমার ধারণা ছিল, এরোপ্লেনের পেট্রোলের ট্যাঙ্ক বুঝি পাইলটিং রুমের এক কোণে থাকে—ওমা! তুমি কি? পেট্রোল ট্যাঙ্ক পাইলটিং রুমে থাকতে যাবে কেন? পেট্রোলের ট্যাঙ্ক থাকে প্লেনের বড় বড় দুটো পাখার নীচে—আশ্চর্য, তুমি কি করে জানলে?—প্যান আমেরিকান এয়ার-ওয়েজের একটা জাহাজে আমি পড়েছি যে—হ্যাঁ। প্লেন টার্ন দেবার পর ঐ যে একটু কালো কালো নীলাভ ধোঁয়া দেখা যায় না, সেই ধোঁয়া বেরোয় ঐ ট্যাঙ্ক থেকে—

—সুররাজ! দুরে তারা আলা আকাশের দিকে তাকিয়ে তরাট নরম গলায় বলল—নীলা পাইলটিং শিখতে আমার বড্ড ইচ্ছে করে—

—শেখো না। কত মেয়ে তো শিখছে। জাপানে মেয়েরাই তো প্লেন চালায়—

—না, তা আর এ জীবনে হবে না সুররাজ। মালয় থেকে

শারদীয়া আত্রেয়ী

চলে এসে বড্ড ভুল করেছি। থাকলে নিশ্চয়ই ছোট মামা উৎসাহ করে আমাকে এয়ারকোর্সে ঢুকিয়ে দিতেন—

—আহা অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? পাইলট না হতে পারো, এয়ার হোষ্টেস তো হতে পারবে। চল না অবনমে দেখবে কত মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী মেয়ে এরোপ্লেনের হোষ্টেস হয়েছে। একদিনে গৌহাটি, কলকাতা, দিল্লী করে চলে যাচ্ছে বাঙ্গালোর কি ত্রিবাঙ্কুর কোচিন—

—তুমি আমাকে ঐ কাজ জুটিয়ে দিতে পারো সুররাজ?

—নিশ্চয়ই, পেশীবহুল ঘাড় ছুটো ছবি বিশ্বাসী কায়দায় ঝাঁকিয়ে বলল সুররাজ চল না কাল আমার সঙ্গে দমদমে? ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনারের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পাইলট গিলবার্টের সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। সে তোমাকে—আঃ ও কি? ও কি করছ? চাপাগলায় ধমকে উঠল শীলা। ধূমকেতু নক্ষত্রের মত তার উজ্জ্বল চোখছুটো ঝকমক করে উঠল। উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলতে বলতে উৎসাহের আতিশয্যে সুররাজ ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরেছিল। উগ্র গলায় বলল শীলা—ছোট ছোট বাচ্চারা যেমন কাঁচা ডাঁসা পেয়ারা দেখলেই হাত বাড়ায়, তেমনি সব সময় তুমি আমাকে ছোঁবার জন্ত ছোঁক ছোঁক কর কেন বলো তো? মেয়েদের সঙ্গে মিশবার এটিকেট তুমি জানো না। দিনাজপুরের বাঁরে কি না—রাগ করো না শীলা—ধমক খেয়ে তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে কাতর গলায় বলল সুররাজ—তোমার কাছে ঘাক চাইছি শীলা—লোভী কুকুরের লেজ নাড়ার মত সে তার ডান হাঁটুটা নাচাতে লাগলো অকারণ। ছাদের অন্ধকার কোণ থেকে সেই হাতভাগা লোকটা আবার টিপ্পনী কেটে উঠল—চিয়—চিয়—চিয় চাঁদের আলোয় সিল্কের সালোয়ার ঝলমলিয়ে ঘনকরা চুল নাচিয়ে সুররাজের দিকে একবার আকুল করা চোখে তাকিয়ে নীচে নেমে গেল শীলা। তারা জলা আকাশের নীচে ছাদের এক কোণে একটা প্রেতের মত দাঁড়িয়ে রইল সুররাজ। বিছে কামড়ানোর মত চিন চিন করে জলে যেতে লাগল তার মনের ভেতরটা। শীলা মেয়েটার মনের কোন থৈ পাওয়া যায় না। ওর জন্ত কি কম খরচ করেছে সে? এ্যাপ্রিনটিস শিপের কী বাকী রেখে রেখে নিজের জামা কাপড় না বানিয়ে, বাড়ী থেকে বাবার পাঠানো টাকা দিয়ে সে শীলাকে কত দিন সিনেমা দেখিয়েছে, বেড়াতে নিয়ে গেছে গঙ্গার ধারে আউটরাম ঘাটে, ইডেনগার্ডেনে, গড়ের মাঠে। কিন্তু একটু অন্তরঙ্গ হয়ে মাখামাখি করতে গেলেই সাপের মত ফণা তুলে সে ফুঁসে ওঠে! কেন? সে কি দেখতে খারাপ? সারা জেলায় দেহশ্রী প্রতিযোগীতায় প্রথম হয়েছে সে! চোখ ফেটে জল এল তার। দূরে আকাশের গায়ে আগুনের ফুলের মত ফুটে থাকা হাওড়া ব্রীজের লাল আলোটা তার দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল। নির্জন এই ছাদে সুররাজের মনে শীলার ঐ তন্বী উদ্ধত দেহ ছন্দ যখন ফুল ফুটিয়ে রক্ত ঝরাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় আড়াই শো মাইল দূরে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অখ্যাত এক গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় হুঁকো টানতে টানতে সগর্ব বলছিল সুররাজের বাবা পাঁচশো বিঘার জোতদার হরিমোহন দাস—হাঁ রে নাটু জানিস? হামার বেটা সুরা তো উড়া জাহাজের ইঞ্জিনীয়ারিং শেখোছে রে! আর দেড় বছর বাদ ওর শিক্ষা শেষ হবি—কত টাকা তোমাক মাস মাস পাঠাবা লাগে মোড়ল? বলল নাটু—তা মাস মাস আড়শো তো পাঠাবা হয়ই হরিমোহন বলল—উড়াজাহাজের ব্যাপার তো। সুরাকে নিত্যি নতুন ধোয়া প্যাণ্ট কোট পিন্ধা হয়। সাহেব সুবার কাও তো—পুরা শিক্ষা শেষ হলি ও কত টাকা মাইনা পাবি?—তা ছেলে ছাড়ে সাতশো টাকা তো পাবিই—এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে পরমপরিতৃপ্তির সুরে বলল হরিমোহন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কেন্দ্র করে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ঝাঁকে ঝাঁকে সোনার ছবি।

বছর খানেক আগে সুররাজ কলকাতায় এসে মেসে বোর্ডিংএ জায়গা না পেয়ে উল্টাডিঙ্গির এই বাড়ীর একতালার একটা ঘর ভাড়া নিয়ে পাইস হোটেলে খেয়ে পড়াশুনা

শারদীয়া আর্কাইভ

করছিল। দোতালার ভাড়াটে করপোরেশন স্কুলের টিচার প্রৌঢ়া বিধবা বিভাদেবী একা মানুষ। ছোকরা সুররাজ তার এটা ওটা ফাইফরমাস খেটে দিত। তাই বিভাদেবী তাকে খুবই স্নেহ করতেন। সুররাজ এ বাড়ীতে আসার কয় মাস পরেই মালয় থেকে এল বিভাদেবীর মেয়ে শীলা। তাঁর ছোট ভাই জানিয়েছেন—তার রবারের ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। নিজেকেই কখন পাততাড়ি গুটাতে হয় তার ঠিক নেই। তাই শীলাকে পাঠিয়ে দিতে সে বাধ্য হলো—সেই দিনই বিকেলে বিভাদেবী সুররাজের সঙ্গে শীলার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন শোন শীলা, সুররাজ খুব ভাল ছেলে। ওকে আমি ছেলের মত ভালবাসি। ও আই, এস, সি পড়ে এরোপ্লেনের গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শিখছে, তুমি ওর কাছে অঙ্ক টঙ্ক শিখে নিয়ে জুনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষার জন্য তৈরী হবে—সুররাজ মুখ তুলে সলজ্জ চোখে শীলার দিকে তাকাতেই খিল খিল করে হেসে সে বলল—আপনি, অমন জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? মেয়েছেলে দেখলেই নার্ভাস হয়ে যান বুঝি! মনে রাখবেন আপনি এ্যাভিয়েশন সার্ভিসে যাচ্ছেন, আপনাকে রীতিমত স্মার্ট হতে হবে।—সুররাজের ডানহাতটা ধরে সে বলল—চলুন বেড়িয়ে আসি—সেই দিন থেকেই সুররাজের দিন রাত্রির ধ্যান হয়ে উঠল শীলা। ওর নীলচে চোখ, আপেল রাঙা দুটো পুরন্ত গাল, ঝকঝকে সোনালী চুল সুররাজের বুকের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল।

দিন কয়েক পর। উল্টাডিঙ্গির নিবারণ দাস লেনে সন্ধ্যা নেমেছে। শীলা উদ্বিগ্ন অস্থির পায়ে পায়চারী করছে ছাদে। বিভাদেবীর হঠাৎ হার্টের অসুখটা বেড়েছে। তিনি বিকেলে হাসপাতালে গেছেন। পা টিপে টিপে চোরের মত ছাদে উঠে এল সুররাজ। ভয়ে ভয়ে ব্যাকুল নরম গলায় বলল—শীলা! তুমি সেদিন আমার ওপর রাগ করেছ?

—না তোমার মত দুর্বল মনের পুরুষের ওপর রাগ আমার হয় না, করুণা হয়—

—কেন?

—তুমি জানো না, কোন মেয়ে যখন কোন পুরুষের ওপরে রাগ করে, তখন ধরে নেবে মেয়েটি তাকে ভালবাসে—

—তুমি যে রকম লাল চোখ করে ধমকে উঠলে। তোমার রাগ হলেই আমার বড্ড ভয় করে শীলা—

—বাঃ তোমাকে ধমকাবো না তো, কাকে ধমকাবো? তুমি যে আমার কত আপন লোক, তা কি তুমি জানো না? আমি যখন রাগ করে নেমে এলাম, তখন তুমি এসে আমার হাতটাও তো ধরতে পারতে। ছিঃ তুমি এমন ব্লাণ্ট্!

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল শীলা। সুররাজের গা ঘেসে দাঁড়িয়ে ব্যাথা ভরা গলায় বলল—জানো সুররাজ, মা হাসপাতালে গেছেন। এত বলি, স্কুলের জন্য এত খেটে না, তা শোনে না। আমার আর এখানে ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে, চলে যাই মালয়ে। ঘন নীল সমুদ্রের ধার দিয়ে নারিকেল গাছের সার। সমুদ্রের হু হু করা হাওয়ায় দিনরাত মাথা কুটছে নারকেল গাছের ঝিরিঝিরি পাতাগুলো। বহুদূরে আনারসের ক্ষেত। তারপরেই পেহাং সহরের টিনের কারখানার চিমনীর ধোঁয়ার একটা কালো রেখা মিশে গেছে নীল আকাশের গায়ে। কী সুন্দর দেশ!

সমুদ্র পারের দেশের স্মৃতি ঘন হয়ে নেমে এল তার চোখের পাতায়।

—আমাদের দিনাজপুরে অবশ্য নারকেল গাছ নেই, কিন্তু আকাশ ছোঁয়া তাল গাছ আছে, আছে বিশাল সমুদ্রের মত ধু ধু সবুজ ধানের মাঠ—কলকল করা গলায় বলে উঠল সুররাজ।

—সত্যি বলছ সুররাজ, সত্যি? আলগোছে তার ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল শীলা—

অমনি ধু ধু সবুজ ধানের মাঠ আমার দেখতে বড় ইচ্ছে করে—

—যাবে তুমি?

—কিন্তু তোমাদের দেশে যাওয়া যে ভারী কষ্ট। রাজমহল পাহাড়ের ধার ঘেসে, গঙ্গা পেরিয়ে, হিমালয়ের কুলিদের

শারদীয়া আর্কাইভ
P24,077

য়ের গুঁতো খেয়ে প্রায় আধমরা হয়ে যেতে হয় বলে ? তুমিই তো বলেছ—

—কি মুস্কিল। তুমি ট্রেণে যাবে কেন ? প্লেনে যাবে। উড়ে চলে যাবে মাত্র এক ঘণ্টায়—

—প্লেন ! বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে শীলা বলল—তুমি প্লেনে যাওয়া আসা কর ? তুমি তাহলে প্লেনে চেপেছো ! কই আমাকে বলো নি তো ?

—হ্যাঁ, আমি তো বরাবরই প্লেনে যাওয়া আসা করি

হঠাৎ শীলার কাণের কাছে বেজে উঠল—'যাই বলো প্লেনে চড়া একটা থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স'

—বহুদিন আগে মালয়ে তার পাঞ্জাবী বন্ধু প্রেমকুমার সিং বলেছিল কথাটা। বরিন্দের দেশের সহজ সরল 'যাই' ছেলেটার প্রতি শীলার মনে এতদিন যে একটা অবজ্ঞা ছিল, সেটা মুহূর্তে বদলে গেল। তার চোখে ফুটে উঠল শ্রদ্ধা মাখানো সম্ভ্রমের দৃষ্টি। সুররাজের কাণের কাছে মুখ নিয়ে এসে গুণগুণ করা গলায় বলল—আমাকে প্লেনে করে তোমাদের দেশে বেড়াতে নিয়ে যাবে সুররাজ, নিয়ে যাবে ?

—তার ঘাড় ধরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল—চুপ করে আছো কেন ?

বলো না নিয়ে যাবে ?

—ভাবছি, বাবা মাকে তোমার কি পরিচয় দেব ?

—কেন ? বলবে বান্ধবী—

—না শীলা। পাড়াগাঁয়ে পুরুষদের কোন মেয়ে বন্ধু থাকে না। বন্ধু বল, সখী বল, আর বান্ধবীই বলো না কেন সব ঐ স্ত্রী—

কয়েক মুহূর্তের জন্য শীলা তারায় চুমকি বসানো আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল। মিহি নরম গলায় বলল—বেশ তো তুমি 'স্ত্রী'ই বলবে। আমাকে বিয়ে করতে তোমার কোন আপত্তি আছে সুররাজ ? শীলার এই কথাটা যেন তীরের মত এসে বিঁধে গেল তার মনে। তার বুকের রক্তে ঢেউ তোলপাড় করে উঠল।

স্ত্রী ! বিয়ে ! এসব তুমি কি বলছ শীলা ?

—তার হাত দুটো চেপে ধরে উত্তেজিত চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল সুররাজ।

—হ্যাঁ ঠিকই বলছি সুররাজ—শীলার বড় বড় দুটো চোখের কোনায় কোনায় বেদনার কালো ছায়া নেমে এল। ভারী গলায় বলল—দেখ বিয়ে তো আমাকে করতেই হবে। মেয়ে হয়ে জন্মেছি, সংসার ছাড়া গতি কোথায় বলো ? আমার এই বিশ বছরের জীবনে ভালো তো বাসলাম কত জনকে। পেহাং সহরের খান্না মোটর ওয়ার্কসের পাঞ্জাবী মালিকের ছেলে প্রেমকুমার সিং ; রবার মার্চেন্ট এক সিন্ধিয়ার ছেলে তাপস মাখিজনী, বাঙালী ব্যারিষ্টারের ছেলে সমীর। এদের সবাই কেই তো প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিলাম। কিন্তু কেউ বাবার ভয়ে কেউ সমাজের ভয়ে আবার কেউ বা মুদ্রার লোভে সরে পড়েছে—

—কি ? এই বদমায়েস গুলো তোমাকে ঠকিয়েছে শীলা ? ধক্ করে জ্বলে উঠল সুররাজের চোখ দুটো। সারা তেলার শ্রেষ্ঠ দেহীর বলিষ্ঠ হাত দুটো নিসপিস করতে লাগল। ম্লান হাসি হেসে শীলা বলল—জানো, সুররাজ, এই বয়সেই কেমন যেন মনে হয় জীবনের চারিদিকে ক্লান্তি নেমেছে। মনে হয়—

—আর বলো না শীলা, আর বলো না আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে কাতর গলায় বলল সুররাজ—তুমি জীবনে এত দুঃখ পেয়েছে শীলা ? কৈ আমাকে বলো নি তো ?

—সুযোগ হয় নি, তাই বলি নি—

—চল কালই সকালের প্লেনে আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে বিয়ে করবো—

—তোমার বাবা যদি

—আরে রেখে দাও তোমার বাবা। আমি বাবার একমাত্র ছেলে। বংশের বাতি। আমি যাই করি না কেন, বাবা তা মেনে নিতে বাধ্য হবে—

—আর তোমার মা ?

—আরে রেখে দাও তোমার মা। বাবা গরু তাড়ানো পার্টি

P24,077

শারদীয়া আত্রেয়ী

হাতে নিয়ে এক ধমক দিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে মা—

—বেশ চল—

—আচ্ছা, শোন, তুমি তাহলে জিনিষপত্র বেঁধেছেঁদে রাখো। আমি বালুরঘাট এয়ার ওয়েজ সিটি বুকিং অফিস থেকে দুটো টিকিট কেটে নিয়ে আসি। কাল ভোর ছ টায় প্লেন—আনন্দে উৎসাহে অস্থির হয়ে একলাফে দু'তিনটে সিঁড়ি একেবারে টপকে নেমে চলে গেল সুরযাজ। ছাদের অন্ধকার কোন থেকে সেই লোকটা ডেকে উঠল চিপ্-চিপ্-চিপ্—

অর্জুন, সুভদ্রাকে হরণ করে দ্রুতগামী রথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ঘোড়ার ওপর তুলে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। মহাপুরুষদের সঙ্গে তুলনায় যদি অপরাধ না হয় তো বলি, আমার পরিচিত এক ফুটবল খেলোয়াড় তার প্রেমিকাকে সাইকেলের কেরিয়ারে বেঁধে নিয়ে তুলেছিলেন নিজের বাড়ীতে। চিরঞ্জন এই প্রেমের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করল নীল বুসসার্ট আর নীল ফুল প্যান্ট পরা ছোকরা সুরযাজ। রাত্রি শেষের অন্ধকারে সে তার প্রিয়াকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের অতিকায় ডেকোটার করে নীল আকাশের বুক চিরে উড়িয়ে নিয়ে চলল পশ্চিম দিনাজপুর। বড় সুরযাজ।

—আঃ ও কি ? ও কি করছ শীলা ? চীৎকার করে উঠল সুরযাজ—প্লেন স্টার্ট করলেই পড়ে যাবে যে! চুপ করে সিটে বস—বাপ্স পার করে উড়ে চলেছে ডেকোটা। বব করা চুলগুলো নাচিয়ে তরিণীর মত প্লেনের ভেতরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে শীলা! আনন্দে খুসীতে তার কালো চোখ দুটো অগাধ করে উঠেছে। কখনও প্লেনের গায়ে ফটগ্রাফ তুলছে, কখনও বা কাঁচের জানালায় মুখ চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত আনন্দে চীৎকার করে উঠছে—দেখ দেখ সুরযাজ, জাহাজের ছোট ছোট খুটির মত দেখাচ্ছে বাড়ীগুলোকে ধানের জমিগুলোকে মনে হচ্ছে, সবুজ কাগজ দিয়ে মোড়া কীমনাগের এক একটা সন্দেশের মতো—

—আঃ চুপ করে বসো না শীলা—চীৎকার করে উঠল সুরযাজ। কিছুক্ষণ পরই পাইলটিং রুমের পাশে ধপ্ করে জ্বলে উঠল—একটা আলো। সেই আলোয় লেখা ফুটে উঠল—Fasten the belt. বেল্ট বাঁধার নির্দেশ দেওয়া হলো। যাত্রীদের ভেতরে গুঞ্জন উঠল—বালুরঘাট এসে পড়েছে। সরু একটা সৈতার মত দেখা যাচ্ছে আত্রাই নদী। দেখা যাচ্ছে, খাদিমপুর, চকচন্দন, চককাশী, ডাকুয়ার বিশাল প্রান্তরে উঁচুনীচু ছড়ানো রিফিউজী কলোনীর অজস্র অগণন কীটের মত ঘরবাড়ীগুলো।

বালুরঘাট এয়ার পোর্ট নেমেই কাশিয়াগঞ্জের বাসে চাপল সুরযাজ আর শীলা। আট মাইল দূরে পতিরাম ছাড়িয়ে তারা এসে নামল বাঁটিচায়। সেখান থেকে সুরযাজের গ্রাম বড় মল্লিকপুর মাত্র তেত্রিশ মাইল। তারা তজনে ছোটোট রওনা দিল। রাস্তার দুপার্শে বরিন্দের বিপুল বাস্তু সবুজ ধানের মাঠ। শরতের সোনাঝরানো রোদ পাতলা সিল্কের ওড়নার মত ছড়িয়ে পড়ছে সেই বিশাল সবুজ সমুদ্রে। চারিদিকের অবাধ প্রান্তরের ওপর দিয়ে বয়ে আসা শোঁ শোঁ করা হাওয়ার সঙ্গে মিশে ভেসে আসছে ঢাকের বাজনা ডাড্যাং—ডাঁ—ডাঁড্যাং—

—লাভলি! লাভলি—কী বিউটিফুল সিট্

—উচ্ছ্বসিত আনন্দে চীৎকার করে উঠল শীলা—বাজনা বাজছে কেন সুরযাজ ?

—আজ যে সপ্তমী পুজো—

হাজার দু'ধারের মাঠের চাষীরা হাতের কাজ ফেলে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল সাদোতার পাঞ্জাবী পরা শীলার দিকে। কেউ কেউ চীৎকার করে তাদের সঙ্গীদের বলল—হাঁ রে দেখিছু, বড়া মল্লিকপুরের মোড়লের বেটা সুরা আওরে পারা গোরো কোন সাহেবের বেটী সাঁথে করে যাছে রে—

—উড়া জাহাজের কাম করে, কে জানে বাপু, কোন কিরিঙ্গী মাগীও হবা পারে—

হুহুকরা হাওয়ায় শীলার খাটো বব করা চুল নাচছে, পত পত করে উড়ছে হলদে ওড়না। তার ঐ বিজাতীয় পোষাক দেখে, চাষীদের কতগুলো ভ্যাংটা ছেলে কলরব করে ছুটে এল। তারা, তাদের পাড়ার দিকে তাকিয়ে উচ্চ সিত গলায় চীৎকার করে উঠল—মেম সাহেব দেখবা চান তো আসো যে সব—ছুটে আসো—

হঠাৎ শীলা, রাস্তার পাশে একটা মেটে বাড়ীর দিকে নির্দেশ করে বলল

—আচ্ছা সুরযাজ, ঐ ঘরটার দেয়ালে ঐ কালো কালো দাগগুলো কিসের?

—ও হরি! তাও জানো না ওগুলো ঘসির দাগ। ঘসি দেয় ঐ দেয়ালে বাড়ীর মেয়েরা—

—আর ঐ ঘরটার পাশে দুর্গন্ধ ভরা নোংরা কালো ঢিপিটা?

—ওটা গোবরের ঢিপি। জমির সার হয় ওতে—প্রত্যেক বাড়ীর বুড়ীরা গোবর কুড়িয়ে নিয়ে ওখানে জড়ো করে—

—আচ্ছা সুরযাজ, বিয়ের পর আমাকেও তবে ঘসি দিতে হবে, গোবর কুড়োতে হবে?

—না, না তোমাকে করতে হবে কেন?

পরম স্নেহে ফিরিঙ্গী কামদার তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে সুরযাজ বলল—ওসব না করবে, বোনেরা করবে। তুমি, আমি শুধু পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরে আর বেড়িয়ে বেড়িয়ে দিন কাটাবো—

—ঠিক বলছো তো? তার কাঁধটা ধরে প্রবলভাবে একটা ঝাঁকি দিয়ে আনন্দোজ্জ্বল গলায় শীলা বলল—কী আনন্দেই দিনগুলো কাটবে না সুরযাজ? মাথার ওপর গাছের আড়ালে থেকে একটা হাঁড়িচাচা পাখী যেন তীব্র কণ্ঠে বিদ্রূপ করে ডেকে উঠল।

ইতিমধ্যেই দিকে দিকে বাতাসের বেগে খবর রটে গেল, হরিমোহনের ছেলে এক ফিরিঙ্গী মেয়ে সঙ্গে করে গ্রামে আসছে! বড় মল্লিকপুর পূজামণ্ডপের সামনে আসতেই গ্রামের লোক সুরযাজ আর শীলাকে মাছির মত ছেঁকে ধরল। জনতার ভেতর থেকে টুকরো টুকরো কথা শোনা যেতে লাগল—

—ধলদীঘি মেলায় ইরানী মাগীগুলো যে ছুরি কাঁচি বেচবা আসে, ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে না রে?

—এই ওর ছায় ভিতিস না। কুঠে চাকু টাকু মারে দিবি বাপু! তখন দেখিস মজা—

—ছাখেক ছাখেক কামকা ধলো দোনালা পেন্ট, হলুদ পিরান পরিছে রে! চোখোত কাজল দিছে—

—আ! এই তোমরা সরো তো, সরে যাও এখান থেকে—বিরক্ত হয়ে চীৎকার করে ধমকে উঠল সুরযাজ।

—কী জাতি বাপু এই মেঁয়ো মানুষগুলো

—নাকটা কুঞ্চিত করে বলল শীলা।

—এই সুরা—বাজপড়ার মত শব্দে একটা তরানক চীৎকারে সব কলরব মুহূর্তে থেমে গেল। গাঁয়ের মোড়ল হরিমোহনকে দেখে সবাই ছিটকে সরে দাঁড়াল। খবরটা তার কাণে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুঁকা হাতে নিয়েই খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে এসেছে হরিমোহন। আগুন ঝরা চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে সে চীৎকার করে উঠল—এ তুই কাকে সাঁথ করে আনিছু? এ কে? মুসলমান না ফিরিঙ্গী?

—আগে চলো বাড়ীর ভেতরে, বলছি সব—

পাথরের মত শক্ত নির্বিকার গলায় বলল সুরযাজ। বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে অবিচলিত গলায় সে বলল—শোন বাবা, ও মুসলমানও নয়, ফিরিঙ্গীও নয়। ও আমি যে বাড়ীতে থাকি, সেই বাড়ীর মোতালার ভাড়াটে বিপত্নীকের মেয়ে। ও বাঙালী এবং ব্রাহ্মণ। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। ওর মা'র অমত হবে না—

—হায় হায় ভগবান, জাতকুল সব খোয়ালো। মরলে যে নরকেও ঠাঁই মিলবি না রে—রান্না ঘরের দাওয়া থেকে আর্ত গলায় চীৎকার করে উঠল সুরযাজের মা—কামরা তাঁড়ি হয়ে ব্রাহ্মণের মেটাক ভাত দিলে যে মহাপাপ হবি রে। পা হাতোত পোকা পড়বি—

মহামুস্কিলে পড়ে গেল হরিমোহন। কোথায় ছেলে গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ছয়শো টাকা মাইনের চাকরি করে

CENTRAL LIBRARY
শারদীয়া আত্রেয়ী

ফিরবে, তা না ফিরল কি না গলায় বড়শি বিঁধিয়ে! এক-দিকে তার বড় আদরের একমাত্র পুত্র, আরেক দিকে সমাজ সংস্কার, ধর্ম। দুদিক থেকে দুটো তীর যেন এসে বিঁধে গেল তার পাঁজড়ায়। ঘরের দাওয়ায় বসে মাথাটা নীচু করে ভাবতে লাগল হরিমোহন। নমঃশূদ্রদের এই গাঁয়ের দণ্ডমুণ্ডের মালিক সে। তাদের সমাজের কোন পতনকে সে কখনো ক্ষমার চোখে দেখেনি, কঠোর হস্তে সে বিচার করেছে। আর তারই ছেলে কি না.....নাঃ একটা কিছু করতে হবে—একটা কিছু করতে হবে। অসহ্য ক্রোধে তার রগ বের করা হাত দুটো নিসপিস করে উঠল।

—তুমি যদি এই বিয়াত মত যাও, তা হলে হামি কিন্তু তোমার ঘর করবা পারমু না—রান্নাঘরের বারন্দা থেকে হিংস্র আক্রোশে সমানে চেঁচিয়ে চলেছে সুররাজের মা—ঐ কিরস্তীর বেটীক হামি ছাওয়ালের বৌ করমু না। উত্তেজনায় হাফরের মত তার বুকটা ওঠা নামা করছে। খসে পড়েছে বুকের কাপড়। ও দিকে হরিমোহনের বাড়ীর সামনে লোকে লোকারণ্য। ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছির মত লোক আশ পাশের গ্রাম থেকে মোড়লের ছেলের বৌ দেখতে আসছে। মূঢ় চোখে সুররাজ তার বাবা মা-র দিকে তাকিয়ে পাথুরে মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। আর শীলা, পশ্চিম দিনাজপুরের এই অজ পাড়াগাঁর মানুষগুলোর বিচিত্র কথাবার্তা শুনে মিটি মিটি হাসতে লাগল। পাড়ার এক বড় জোদ্দার পূর্ণ দাস, হরিমোহনের কাণে কাণে বলল—মোড়ল! চুপচাপ বসি থাকা কাজের কথা নয়; মুঠে থে কার বেটিক নিয়ে আসছে তোমার ব্যাটা কে জানে? তোমাক পুলিশ টানাটানি করবা পারে। তুমি বোটের পেসিডেণ্টকে ডাকে নিয়ে আসে একটা হেস্তনেস্ত কর—

—ঠিক কথা—বলেই, ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠল হরিমোহন। ছুটে বেরিয়ে গেল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বাড়ী, দুই মাইল দূরে বোল্লা গ্রামে। পাঁচ থেকে পাঁচপার পর্য্যন্ত সমস্ত বয়সের মেয়ে বৌরা সুররাজের মা-কে ঘিরে দাঁড়িয়েছে উঠানের এক কোণে। তারা সবাই সান্ত্বনা দিয়ে বলছে—হায় হায় সুরার মা তোমার ব্যাটা শ্যাষ পর্য্যন্ত এই কাণ্ড করবে কে জানে—

—তোমার ব্যাটাক কিন্তু শুন করিছে ঐ কিরিস্তীর বেটী। তুমি মাসনা কালীর (মশান কালী) থানোত মানত কর সুরার মা—বলল পূর্ণ দাসের বুড়ী মা।

—জোড়া পাঁঠা মানত করিছুঁ দিদি মনে মনে। আতোত (রাত্রে) থানোত যায়ে মাথা ঠুকমু—কান্নাভাঙ্গা গলায় বলল সুররাজের মা। আর ধৈর্য্য ধরতে পারল না। কলকাতা ফেরত নীল বুস সার্ট পরা স্মার্ট সুররাজের চোখ দুটো দুখণ্ড আগুনের মত চক চক করে উঠল। চীৎকার করে মাকে বলল—কিসের তোর অত কান্নাকাটি? আমার ঘরের চাবি দিবি কি না বল—জামাকাপড় ছাড়মু. খিদায় পেট জ্বলে যাছে—

—চুপ করেক পোড়ামুখা। তোর মুখোত মুড়া জ্বালে দিমু—ধমকে উঠল সুররাজের মা।

—বোটের পেসিডেণ্টের সাঁথে কথা বলে দশের মধ্যে একটা মিটমাট না হলি তোমার ঘরোত যাওয়া হবি না সুরা—বলল পূর্ণ দাসের মা—

—আসিছে রে—বোটের পেসিডেণ্টবাবু আসিছে—বাইরে জনতার ভেতরে মৃদু গুঞ্জন উঠল। অজানিত একটা আশঙ্কায় সুররাজের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সে বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে বলে, সমস্যাটা যত সহজে মিটে যাবে মনে করেছিল, তা হয়তো হবে না—

—শোনেন পেসিডেণ্টবাবু। খুব মন দিয়ে বিচার করবেন কিন্তুক—মোড়লের ব্যাটার কিত্তি বলে হামরা কেউ অন্যাচার সহ্য করমু না আগে-ভাগে বলে রাখছি—জোরগলায় বলল পূর্ণ দাস।

—তোমরা উত্তেজিত হয়ো না। আমি ঠিক বিচার করে দেব—বলল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নগেন চক্রবর্ত্তী। প্রেসিডেণ্ট হলেও সে বয়সে নবীন। গায়ে ময়লা তেল-চিটকে একটা লাল খদ্দরের জামা। বুদ্ধি দীপ্ত দুটো

শারদীয়া আত্রেয়ী

চোখ। বৈঠকখানার বারান্দার চারিদিকে অপেক্ষমান জনতার ভেতরে একটা মোড়ায় বসে ভরাট গলায় নগেন চক্রবর্ত্তী, হরিমোহনকে বলল—শোন মোড়ল, যে মেয়েটি তোমার ছেলের সঙ্গে—কলকাতা থেকে এসেছে, সে নিশ্চয়ই সাবালিকা। সে যদি তোমার ছেলেকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে কোন আইনেই তাকে তোমরা বাধা দিতে পারবে না—

—বাবু, যেমন করে পারো, তোমাক একটা বুদ্ধিসুদ্ধি যাতলে দিবা হবি— হাতজোড় করে বলল হরিমোহন—ঐ ফিরিঙ্গীর বেটীক ব্যাটার বৌ করলে হামার পরিবার আত্মহত্যা করবি—

—কেন? তুমি যে বললে বামনের মেয়ে?

—ঐ হারামজাদা তাই বলোছে বটে, কিন্তুক চেহারায় তো ইরাণী মাগীর মত মালুম হয়—দেখ আমি গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী ভরাট গলায় বলল নগেন চক্রবর্ত্তী শ্রেণী-হীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আমাদের কংগ্রেসের আদর্শ। তাঁতির ছেলের সঙ্গে বামনের মেয়ের বিয়ে হলে একটা আদর্শ বিয়েই হবে। আর ওদের মধ্যে যদি ভাব ভালবাসা হয়েই থাকে—

—বেশ, ঐ বামুনের বেটীক ডাকে শুধে শুনা না কেন বাবু? —বলল পূর্ণ দাস—সুরাক বিয়া করে এঠি থাকবি, না কলকাতা চলি যাবি—যদি কলকাতা চলি যায় তাহলে হামাদের আপত্তি নাই—জনতা চীৎকার করে উঠিল।

—বাবু, তোমরা থাকতে হামার একটা মাত্র ব্যাটা ঘর ছাড়ে চলি যাবি—দুহাতে বুক চেপে ধরে হাউ হাউ করে শিশুর মত কেঁদে উঠল হরিমোহন। বাড়ীর ভেতরেও চাপা কান্নার শব্দ আরও তীব্র হয়ে উঠল। ফোটা ফোটা ঘাম জমল নগেন চক্রবর্ত্তীর কপালে। কোঁচা দিয়ে কপালটা মুছে সে বলল—আচ্ছা মোড়ল ঐ মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে এস তো—তোমার ছেলে যেন না আসে—বাড়ীর ভেতরে খবর পাঠান হরিমোহন। কয়েকমুহূর্ত্ত পরেই ওড়না উড়িয়ে সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে সালোয়ার পাঞ্জাবী পরা শীলা শরতের শিশিরে ভেজা একটা গন্ধ-রাজের মতই বৈঠকখানায় এসে দাঁড়াল। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল কৌতূহলী জনতার কলগুঞ্জন। ছোকরা প্রেসিডেন্ট নগেনেরও চোখদুটো যেন ঝলসে উঠল। আশ্চর্য কী রূপ! এরা যে 'ফিরিঙ্গী' 'ফিরিঙ্গী' বলে চীৎকার করছে—তাদের অনুমান তো মিথ্যে নয়। এই মেয়েকেই ঐ কালো হোঁতকা ছেলে সুররাজ যোগাড় করল কি করে। লাল টোপা টোপা গাল। কেমন নীলচে চোখ। পাতলা পাঞ্জাবীর আড়ালে ওর সুডৌল বুকের রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কথা বলার আগেই নগেনের গলার ভেতরটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। অনেক কষ্টে বলল—আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, মনে কিছু করবেন না তো?

—না।

—সুররাজকে আপনি ভালবাসেন?

—হ্যাঁ।

—আপনি ওকে বিয়ে করে এই অজ-পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারবেন?

—বিয়ে! অজ-পাড়াগাঁয়ে থাকা!—পাগলের মত আপনি এসব কী বলছেন?

—কেন? এরা সবাই বলছে—

—সুররাজ আমার বন্ধু। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু যেমন নতুন দেশে বেড়াতে যায়; আমি তেমনি এসেছি—

—এ কী শীলা? তুমি তাহলে বিয়ে করবে না? ঝড়ের বেগে বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে এল সুররাজ। উত্তেজনায় উদ্বেগে তার চোখদুটো জ্বলছে। সে দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করলনা শীলা। ব্রস্তহাতে জীপ ক্যাসনারের চেনটা খুলে, তরমুজরাঙা রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছে হরিমোহনকে, নগেনকে বলল—আপনারা সবাই বিশ্বাস করেন। ছোটকাল থেকে উড়োজাহাজে চড়ার আমার বড্ড সখ। আমি সিম্পলি, 'প্লেনে' চড়ার লোভে সুররাজের সঙ্গে এসেছি—সে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এল হতভম্ব

সুররাজের কাছে। তার দাত দুটো ধরে অতুলনয়তরা নরম গলায় বলল—তুমি আমার বন্ধু। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু ঠাট্টাও তো করে। ধরে নাও এটা একটা প্রাকটিক্যাল জোক্। তুমি কিন্তু দুঃখিত হয়ো না ভাই। তোমার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে জীবনে প্রথম প্লেনে চাপিয়েছ —বৈঠকখানা ঘরের ভেতরে যেন বাজ পড়েছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। সুররাজের গলা দিয়ে এত টুকু শব্দ বেরল না। শুধু বেতনী ঠোঁট দুটো থর থর করে কেঁপে উঠল। যেন অসাড় হয়ে গেছে তার চেতনা। অর্থহীন, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শীলার উত্তেজিত রক্তিম মুখের দিকে। বড় মল্লিকপুর গ্রামের 'বাবে' মানুষগুলোর বিস্মিত স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে হঠাৎ বাড়ীর ভেতর থেকে কল কল করা গলায় বলে উঠল সুরার মা—বাবাঃ হামার বুকের থে একটা বোঝা নামি গেল—

—মাসনাকালী তোর দিকে মুখ তুলি তাকাইছে রে সুরার মা—উল্লাসে চীৎকার করে বলল পূর্ণ দাসের বুড়ী মা।

আধুনিক সভ্যতা থেকে বহুদূরে শান্ত স্তব্ধতার প্রবাল বলয় দিয়ে ঘেরা বরেন্দ্র-ভূমির অবখ্যাত এই গ্রামের এক-প্রান্তে হরিমোহনের নিশ্চিন্ত শান্তির সংসারে সহসা থেকে হঠাৎ উড়ে আসা মূর্তিমতী বিভীষিকাটাকে তখুনি সহরে ফিরিয়ে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হলো। বড় মল্লিকপুরের জনতা দেখল, মোড়ল নিজেই ধলদীঘি মেলায় কেনা তার তেজীয়ান বলদের গাড়ীতে করে শীলাকে নিয়ে চলেছে বাঁধাঘাটের দিকে। তীর বেগে ছুটছে গাড়ী। গাড়ীর ঘন লাল টুকটুকে ছইয়ের ফাঁক দিয়ে পত পত করে উড়ছে শীলার হলদে ওড়নাটা। দূরে রাস্তার বাঁকে তালগাছের আড়ালে ঘননীল দিগন্তের কোলে গাড়ীটা একটা কালো বিন্দুর মতই মিশে গেল। সে দিকে তাকিয়ে বৈঠকখানার বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বাজপড়া ঠুটো তালগাছের মত দাঁড়িয়ে রইল সুররাজ। চোখের জলে তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে।

মটরাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

নেপথ্যের সজ্জাগৃহে কেন তুমি ডাকো বারবার
আমি যে দর্শক তা-ও জানোনা অভ্যাস ?
আমি শূন্য বহুযুগ হতে যেন তোমার আমার
বিচ্ছেদ-স্বাক্ষর মঞ্চে হয়ে গেছে, আজ আমি প্রজা।
তুমি নাট্যপতি নিয়ে সুখে করো বাস
আমি দেখে যাব বনবাস।
আমি ব্যর্থ মিথিলার ভালোবাসা তোমার নদীর
পুড়ে যাই কামমনে, চন্দনা-অধীর

হৃদয় প্রজ্ঞা চায় আতপের দেখে।
অমর্নার তীব্র দেখে প্রেক্ষাগৃহে থেকে
আসতেই হলো, বেশি দর্শকের নেশা।
এখন উত্তরা-ধ্যান পেশা
সেখানে, যেখানে নাট্যালয়।
অবিনীত অভিনেতা করে করে জয়
গড়ে যাব রঙ্গমঞ্চ দ্রুত যাতে ঘণার প্রলয়।

ডাকিনী

শ্রীশিশিরকুমার সরকার

কোর্ট হাজতে স্তব্ধভাবে বসে আছে জেঠা গুরুং। জাতিতে নেপালী হলেও বেশ দীক্ষল দোহারা চেহারা। ঈষৎ বসা-নাক গৌরবর্ণ সুন্দর সুঠাম দেহে যৌবনের দেমাক জঙ্গী ঘোড়ার মত টগবগ করছে। খুনের আসামীর দুশ্চিন্তা ওকে কিছুটা বিবর্ণ ও বিমনা করছে। হাজতের মোটা মোটা লোহার শিকগুলোর ভেতর দিয়ে নাক গলিয়ে জেঠা দূরের ওই টুকরো আকাশখানার দিকে তাকালো। আর কি কোন দিন ওই নীল আকাশখানার তলে এসে ও দাঁড়াতে পারবে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো জেঠা। ...কত দিনের কথা, কত অসংখ্য ছোট টুকরো কথা ওদের—ওর আর মায়লীর—সব ভিড় করে মনে পড়তে লাগলো জেঠার।

জেঠা ও মায়লী একই গাঁয়ের ছেলে মেয়ে। মায়লীর বাবা ছিলেন ওদের গ্রামের মণ্ডল প্রধান; আর জেঠার ছিলেন তাঁর সহকারী। একই গ্রামের পাঠশালায় ওদের হাতে-খড়ি। ওরা প্রায় সমবয়সী। জেঠা মায়লীর চেয়ে প্রায় দু' বছরের বড়। চুলোচুলি, হাসিকান্না, সুখ দুঃখ মিশিয়ে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত ওরা বট-পাকুড়ের মত বেড়ে উঠেছিল। গ্রামের সমবয়সী ছেলে মেয়েরা ওদের রাম-সীতা বলে ঠাট্টা তামাসা করতো। গ্রামের পড়া শেষ করে জেঠা গেল কালিমপঙে ছেলেদের হাই স্কুলে আর মায়লীর গেল মেয়েদের হাই স্কুলে। পূজার বন্ধে ওরা দুজনেই বাড়ী এসেছে। "ডেউসীর" উৎসবের দিন বিকেল বেলা মায়লী ভাল এক বোতল বিলাতী মদ নিয়ে জেঠার পড়ার ঘরে ঢুকলো। জেঠা কি যেন একখানা বাঙলা উপন্যাস পড়ার মশগুল ছিল। মায়লী পা টিপে ঘরে ঢুকে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর অতি-সাবধানে বোতলটি ও টেবিলের উপর রাখলো। জেঠা উপুড় হয়ে বুকে বালিশ দিয়ে বই পড়ছিল। মায়লী অতি সতর্কভাবে জেঠার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে দুহাতে জেঠার চোখ দুটি চেপে ধরলো। জেঠা টের পেয়েছে; কিন্তু মিথ্যে করে ও সব অন্যনাম বলতে লাগলো—জেঠী, শায়লী ...কাজী...

উঁ—হুঁঃ, হুন্দেইনা—ভজহু পরছো—মায়লী মৃদু হাসতে লাগলো। জেঠা তবু চুপ করে রইল। মায়লীর দেহের স্পর্শ··কেসের বাস জেঠাকে মাতাল করে।

পারদেইশ ? মায়লী জিজ্ঞেস করে তেমনি মৃদু হাসতে লাগলো। এইবার জেঠা এক হাত দিয়ে ওর এক-খানা হাত চেপে ধরে হাসতে হাসতে বললো—বন বিড়ালী মায়লী।

তারপর উভয়ে হাসতে হাসতে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ আলাপ প্রলাপের পর মায়লী কাচের গ্লাসে করে জেঠাকে মদের অর্ধেকটা ঢেলে দিল। নিজের জন্যও কাপে করে খানিকটা মদ ঢেলে নিল। দারুপান করতে করতে মায়লী বললো—শুনেছো, জেঠা দাজু? লোকে বলে আমরা নাকি রাম-সীতা। আমি ভাবি—বেশতো যদি আমাকে কোন দুরন্ত রাবন চুরি করে নিয়ে যায়, তবে আমার রামই সবংশে সেই শয়তান রাবণকে ধ্বংশ করে আমায় আবার স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। বলে মায়লী উৎসুক নয়নে জেঠার দিকে চেয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

জেঠাও স্থির দৃষ্টিতে একবার মায়লীর দিকে চাইল; তারপর হাসতে হাসতে বললো—নিশ্চয়, নিশ্চয়—একে-বারে জান কবুল। বলে বুকটা যথা সম্ভব ফুলিয়ে জেঠা তাহাতে তিনটা টোকা দিল।

ইস্, বীরপুরুষ রামচন্দ্রই বটে !—মায়লী আবার খিল খিল করে হেসে উঠে মদের পেয়ালায় চুমুক দিল। ..

আর একদিন। জেঠাদের বাঁশবাড়ির জাম গাছে ডাল ভেঙে জাম ধরেছে। জেঠা আর মায়লী জাম খাবার মতলবে জাম গাছের তলায় এসে হাজির হোল। জেঠা গাছে চড়ে থোকা থোকা জাম পেড়ে মায়লীকে দিতে লাগলো, আর মায়লী আঁচল পেতে ধরতে লাগলো। এমন সময় কোথা থেকে একটা জংলী ভালুক সামনের দু' পা'তুলে ঘুঁৎ ঘুঁৎ করতে করতে ছুটে এলো মায়লীর দিকে।

মায়লী, শীগ্‌গীরি পালা কোন গাছের আড়ালে।—জেঠা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো।

তার বলার আগেই দুঃসাহসী মায়লী পাশেই একটা চালতা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। নির্ব্বোধ পশুটা গাছ সমেত জড়িয়ে ধরতে চাইল মায়লীকে। বেই সাপটে ধরা অমনি গাছের ও-পাশ দাঁড়িয়ে মায়লী পশুটার সম্মুখের দু'পা সজোরে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো—জেঠা দাদু, শীগ্‌গীরি নেমে এস। তোমার কুকরী খানা দিয়ে জানোয়ারটাকে টুকরো করে ফেল। আমার জীবন থাকতে জানোয়ারটা আর পালাতে পারবে না।

জেঠাও এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। গাছ থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে ধারালো কুকরী খানা দিয়ে পশুটার মুখটা কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো জেঠা। ভীষণ আর্ত্তনাদ করে পশুটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। জেঠা মায়লীর হাত ধরে টানতে টানতে ছুটে পালালো। বাড়ির উঠোনে এসে ওরা হাঁফ ছেড়ে দাঁড়ালো।

মায়লী হাসতে হাসতে বললো—রাবণ হরণ করার আগে, ভালুকেই তোমার সীতাকে সাবার করেছিল আর কি !

রাম বেঁচে থাকতেই সীতা সাবার। মুখের চায়টি খানি কথা নয় গো—কথা নয়। —দেখলে তো বাহুবল ? তবুতো এখনো ধনুক-বাণে হাত দেইনি !—বলে জেঠা মৃদু হাসলো।

তা বটে। সীতাদেবী পশুটার সঙ্গে যখন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন শ্রীশ্রীরামচন্দ্র গাছের ডালে বসে উপদেশ বিতরণ করছেন। যখন পশুটা বেকায়দায় পড়ে কাবু হয়ে পড়েছে, তখন বাঁধা পশুটাকে কুকরী দিয়ে কুপিয়ে কেটেছেন। তাতে বাহুবলের যথেষ্ট পরিচয় আছে বই কি।—মায়লী খিল খিল করে হেসে উঠলো। জেঠাও ওই হাসিতে যোগ দিল। বাস্তবিক, মায়লীর সাহসের যেন সীমা নেই।...

সত্যি সত্যি এক দিন সীতাহরণ হোল। অবসর প্রাপ্ত সেনাবিভাগের একজন সুবেদারের সহিত মায়লীর বিয়ে হয়ে গেল। ভদ্রলোকের অনেক জায়গা জমি এবং কালিমপং সহরের উপর দু'খানা বাড়ি আছে। মায়লীদের স্বজাতি ছত্রী। টাকা পয়সা ধন-দৌলৎ দেখেই মায়লীর বাবা মুগ্ধ হলেন। মায়লীর মনের দিকে কেউ চাইল না। চাইবে কি করে ? জেঠারা জাতের দিক থেকে কিছুটা নীচু ; তারপর তাঁরই সহকারীর পুত্র। মায়লীর বাবার কাছে এ-প্রস্তাব উত্থাপন করতেই কেউ সাহসী হলো না। জল-ভরা চোখে স্বামীর ঘর করতে চললো মায়লী। যাবার আগে জেঠার সাথে দেখা করতে এলো মায়লী।

ও সজল নয়নে জেঠাকে বললো—জেঠা দাদু, সীতা হরণ শেষে সত্যিই হলো। এ বড় দুরন্ত রাবণ। কলি-কালে সীতা উদ্ধার আর কি হয় ! একালে শরীর চেয়ে সামাজিক মান-সম্মান, ধন-দৌলত অনেক বেশী লোভনীয়।

করুণ নয়নে কাঁদতে লাগলো মায়লী। জেঠা মিনিট-খানেক স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ওর ভাষা যেন হারিয়ে গেছে। কণ্ঠও কান্নার চাপে বন্ধ হয়ে আসছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে জেঠা মায়লীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—ছিঃ ছিঃ মায়লী, অমন কথা মুখে এনো না। তোমার বিয়ে বেশ ভাল হয়েছে। সুবেদার সাহেব তেমন বুড়ো নন। তারপর তাঁর টাকা-পয়সা, জমি-জায়গা, মান-সম্মান যথেষ্ট আছে। তুমি সুখে থাকবে, বোন ! —ছিঃ, শুভক্ষণে অমন করে কেঁদো না।

বাঃ, এই তো, এর মধ্যেই তুমি বেশ হিসাবী মানুষ হয়ে উঠেছো। টাকা পয়সা মান সম্মানে তোমার যথেষ্ট তোমার সীতার আজ হরণ হয়—আজ তার পাতাল প্রবেশ। —মায়লীর গলায় স্বর অভিমানে ভারী হয়ে উঠলো।

সে একটা প্রণাম করে জল-ভরা চোখে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। সেই অশ্রুমতি মায়লী আজো জেঠার চোখের উপর যেন ভাসছে।.....

আরো কয়েক বছর পর। জেঠার মা-বাবা স্বর্গগত হয়েছেন। জেঠার সংসারে কেবল মাত্র তার এক বৃদ্ধা পিসী। জেঠা গুরুতরভাবে পীড়িত। মায়লীর বাবাই ওকে দেখা-শুনা করছেন। খবর পেয়ে মায়লী ছুটে এসেছে। শয্যায় লীন রোগ-পাণ্ডুর চেহারা দেখে মায়লী কেঁদে আকুল। মায়লী নিজের বাবাকে বকাবকি করলো। জেঠাকেও খুব খানিকটা গালমন্দ দিল। এবং সেই দিনই মটর রিজার্ভ করে মায়লী জেঠাকে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে এলো। দীর্ঘ মটর ভ্রমণের ফলে রোগীর অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠলো। নিদারুণ রক্তশূন্যতায় রোগী যায় যায়। রক্ত চাই, রক্ত চাই;—কে রক্ত দেবে?

আমি দেব। —মায়লী ডাক্তার বাবুর কাছে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালো। আপনি দেবেন? আপনি রোগির কে হন? —ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

আমি রোগীর বোন। —মায়লী ছল ছল নেত্রে বললো।

বা, বা,—বেশ বেশ! বোন না হলে আর কেউ এমন করে সেবা করতে পারে। ছিঃ ছিঃ, কাঁদবেন না, রোগী ভাল হয়ে যাবে। রোগীর বা আপনার কোনরূপ অসুবিধা হলে নির্ভয়ে আমাকে বলবেন। —ডাক্তারবাবু সান্ত্বনা দিয়ে নার্সের সঙ্গে রোগীর শয্যা-পার্শ্বে মায়লীর-ও থাকার ব্যবস্থা করে গেলেন।

তিন তিনটি বিনিদ্র রাত্রি মায়লী ঠায় অচেতন জেঠার রোগশয্যার পাশে বসে কাটালো। মায়লী রক্ত দিল—তিন তিন বার রক্ত দিল। জেঠা প্রাণ পেল—জেঠাকে প্রাণ দিল মায়লী।.....

আরোও কিছুদিন পর। জেঠা কলেজে পড়ছে। একদিন একখানা চিঠি পেল জেঠা—মায়লীর চিঠি। জেঠা অনেক দিন মায়লীর চিঠি পায়না। অতি আগ্রহভরে চিঠি-খানি খুললো ও।

মায়লী লিখেছে—

জেঠা দাদু,

অনেক দিন পর আজ আর তোমাকে চিঠি না লিখে থাকতে পারলাম না। জানি এই চিঠি তোমাকে বজ্রের আঘাত দিবে। কিন্তু তবুও তোমাকে না লিখে আর লিখবই বা কাকে! বাবা যথেষ্ট বুড়ো হয়েছেন এবং মৃত্যুর পথযাত্রী! তাঁকে একথা জানিয়ে আর তাঁর সেই যাত্রার পথ সুগম করতে চাইনে। অনেক দিন ধরে সুযোগ খুঁজে খুঁজে আজ চিঠি লেখার সুযোগ পেয়েছি এবং অতি গোপনে তোমাকে এই চিঠি দিচ্ছি। তোমাদের সুবেদার ভগ্নী-পতি এ খবর জানতে পারলে আমাকে জ্যান্ত কবর দিবেন, যেন।...তোমার সেই অসুখের সময়; তোমাকে রাত্রি জেগে যে সেবা-সুশ্রূষা করেছি, তাই এখানে অতি কুৎসিত কাহিনীর আকারে প্রচারিত হয়েছে। সুবেদার সাহেব আজকাল আমার চরিত্র সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ পোষণ করেন। তোমার নাম পর্যান্ত তিনি শুনতে পারেন না। তুমি যত-দিন জীবিত আছ, ততদিন আমার বাপের বাড়ী যাওয়াও নিষেধ। তুমি আমার কাছে এ চিঠির জবাব দিওনা। যদি পার গোপনে একবার আমার সঙ্গে দেখা করো। আর বেশী কিছু লেখার সময় নাই। আজো ব্যাকুল হয়ে ভাবছি। বন্দিনী তোমার এ সীতার কি উদ্ধারের কোনই উপায় নেই? যদি থাকে তবে তবে তার ব্যবস্থা করো। আমায় ভালবাসা নিও। ইতি—

প্রণতঃ—তোমারই বন্দিনী সীতা।

এরপর জেঠা—ও মায়লী একদিন পালালো। একেবারে পশ্চিম নেপালে। সুবেদার সাহেবও চুপচাপ বসে থাকার লোক নন। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে অনুসন্ধান করতে লাগলেন

CENTRAL LIBRARY
শারদীয়া আবেগী

ওদের। বৃটিশ সেনা বিভাগের অবসর প্রাপ্ত সুবেদার ; নেপালী সমাজে তাঁর যথেষ্ট মান প্রতিপত্তি। নেপালী পুলিশের সহযোগিতায় সুবেদার সাহেব কিছু দিনের মধ্যেই ওদের ধরে ফেললেন। ' মান সম্মানের ভয়ে মামলা মোকদ্দমা করলেন না সুবেদার। তার পরিবর্তে যথেষ্ট প্রহার দেওয়া হোল জেঠাকে। পিটনের চোটে জ্ঞান হারিয়ে ছিল জেঠা। আধমারা অবস্থায় জেঠাকে ফেলে রেখে, মায়লীকে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে সুবেদার ও তার দল-বল চলে এসেছিল। এরপর চললো মায়লীর উপর অকথ্য অত্যাচার। মিলিটারী মানুষ মিলিটারী কায়দায় দফায় দফায় চললো উৎপীড়ন। এখনো মায়লীর গায়ের কাপড় খুলে ফেললে দেখা যাবে—চাবুকে কাটা ক্ষত চিহ্নে সারা পিঠ খানা চিত্রিত হয়ে আছে। পায়ে ঠ্যাংড়ো লাগিয়ে সাত দিন সাত রাত্রি কুঠরিতে ফেলে রাখা হয়েছিল মায়লীকে ; একমাত্র জলছাড়া তাকে কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি। যার ফলে ওর বাঁ' পা' খানা কিছু দিন অসাড় হয়েছিল। সাধারণ মানুষ সে অত্যাচার দেখলে শিউরে উঠবে।

আবার কাটলো বছর দুই। জেঠা পড়া-শুনায় মন দেবার চেষ্টা করছে। আবার মায়লীর চিঠি এলো। এ চিঠি আগের চিঠি থেকেও ভয়াবহ। মায়লী লিখেছে—

জেঠা দাজু,

আর পারছিনে। মা-বাবার উপদেশ, তোমার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছি। তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু সইলাম। কিন্তু মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা আছে। তোমাদের সুবেদার সাহেব অত্যাচারের নতুন নতুন ফন্দি-ফিকিরে ত্রেতাযুগের রাক্ষস-দেরও হার মানিয়েছেন। আজ মায়লীর উপর যে অত্যাচার চলছে দিনের পর দিন, তা কেবল তোমাদের মায়লী বলেই সহ্য করতে পারছে; অন্য মেয়ে হোলে এতদিন আত্মহত্যা করতো। আমিও আজকাল ওই বিষয় চিন্তা করতে আরম্ভ করেছি। জেঠা দাজু, সীতাদেবীর দুঃখে নাকি ধরণী দ্বিধা হয়েছিল। কিন্তু আজকালকার ধরণী তো দ্বিধা হয় না। যদি বসুন্ধরা দ্বিধা হতেন, তবে তোমার সীতাকে আর এত-দিন এ-পৃথিবীতে দেখতে পেতে না। আমিতো পাতালে প্রবেশের জন্য কোমরে কাপড় বেঁধে প্রস্তুত। কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একবার দেখার বড় ইচ্ছা করছে। তুমি কোন প্রকারে আমাকে একবার দেখা কি দিতে পার না? যদি পার, তবে পনের-ষোল দিনের মধ্যে একবার দেখা দিও। এরপর এলে, হয়তো তোমার সাথে আমার আর এ জীবনে দেখা হবে না। আরো কত যে কিছু লিখতে ইচ্ছা করে; কিন্তু সময় সুযোগ কই? খবরদার চিঠিতে জবাব দিও না। ভালবাসা—হয়তো এই শেষ—নিবেদন। ইতি—

তোমাদের—"মায়লী"।

এই চিঠি পেয়ে জেঠা উন্মত্তের মত সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলো। তার পরের দিন তার হাতে যা টাকা পয়সা ছিল এবং ব্যাঙ্কে যা গচ্ছিত ছিল—সব তুলে নিয়ে কালিম্পঙে রওনা হোল জেঠা। সহরের উপকণ্ঠে এক কাঠুরিয়ার বাড়িতে আশ্রয় নিল ও। পাশেই ঘনবন পাহাড়ের গা বেয়ে কোথায় গিয়েছে, কে জানে? কাঠুরিয়ার বাইরের একখানা ঘরে থাকে জেঠা; আর সারা রাত্রি মায়লীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। 'আমি এসেছি— প্রস্তুত থেকো'। —এই সংবাদটি অতি কষ্টে জানিয়েছে ও মায়লীকে ওই কাঠুরিয়ার স্ত্রীর মারফৎ। ...শীগ্‌গীর সুযোগ এলো। দেওয়ালী উৎসব এসেছে নেপালী সমাজে। সারা পাহাড়ী সমাজ পান-পাগল হয়ে উঠেছে। প্রথম শীতের নিশিথ রাত্রি। টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। দেওয়ালির দীপাবলী ধীরে ধীরে সব নিভে গেছে। ঘরে ঘরে নেশাখোর নেপালী নর নারী নেশার ঘোরে অচেতন মৃতের মত পড়ে আছে। ...জেঠা পা থেকে মাথা অবধি 'মিলিটারি' সাজে সজ্জিত। প্রয়োজন হোলে নিজেকে মিলিটারী অফিসার বলে চালিয়ে নিতে পারবে। দেহের দু' পাশে কোমর বন্ধে বিরাট দুখানা ভোজালী। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরুল জেঠা। কী ঘুটঘুটে অন্ধকার! মনে হয়, দু'হাত দূর থেকেও কাউকে

CENTRAL LIBRARY
শারদীয়া লাইব্রেরী

চেনা যাবে না। এমন সময় কাছেই গাছে একটা রাত চরা পাখী ডেকে উঠলো। কি ভীষণ বিশ্রী ডাক! কাল-পেঁচা নাকি! জেঠার বুকটা হঠাৎ অজানা আশঙ্কায় একটু কেপে উঠলো। একটু থামলো জেঠা। দূর দূর—সব দুর্বলতা; ও আবার টর্চের আলো ফেলে পথ চলতে লাগলো।

মায়লীদের বাড়ির অদূরে একটা বিরাট পাইন গাছের তলে এসে দাঁড়ালো জেঠা। গতবারও এই গাছের তল থেকেই শিস্ দিয়ে ও ডেকেছিল মায়লীকে। জেঠা শিস্ দিল। ধীরে ধীরে খিড়কীর দুয়ার খুলে গেল। জেঠা আবার শিস দিয়ে ডাকলো। সর্বাঙ্গ কালো ভুটানী কম্বলে ঢেকে একজন মহিলা জেঠার সামনে এসে দাঁড়ালো।

মৃদুস্বরে ডাকলো সেই মহিলা—জেঠা দাদু?

হ্যাঁ, মায়লী। সুবেদার সাহেব কি করছেন?—বললো জেঠা।

সন্ধ্যা থেকে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মদ খেয়ে, মাতলামী করে কাটিয়েছেন। এখন নেশায় অচেতন হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। —বিরক্তিভরে বললো মায়লী।

তবে এই সুবর্ণ সুযোগ। চল, পালাই এবার একেবারে তিব্বত। ওই বনের ধারে ঘোড়া আমাদের প্রস্তুত। —বললো জেঠা।

মায়লী আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো একবার জেঠাকে। সহসা জেঠার কোমর থেকে ও বড় ভোজালী-খানা একটান মেরে বের করলো। তারপর বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে বললো—না না, আর না। শত্রুকে পিছে রেখে যাব না।

মায়লী ভোজালীখানা হাতে করে ছুটে গেল তার শোবার ঘরে। একটু ভয়ে ভয়ে পিছু পিছু গেল জেঠা। বাইরে দাঁড়িয়ে ও জানলা দিয়ে উঁকি মারলো। কি সর্ব্বনাশ! মায়লী সোজা কোপ বসিয়েছে সুবেদারের গলায়। একটা দুর্বোধ্য গোঙ্গানির সঙ্গে নিদারুণ উত্তেজনায় সুবেদার উঠে বসার চেষ্টা করতেই আবার পড়ে গেলেন। তাঁর ঘাড় থেকে মুণ্ডটা একধারে ঝুলে পড়েছে। মায়লী উন্মত্তের মত কুপিয়ে চললো মিনিট খানেক। সুবেদারের মুখখানা অতি বিভৎস ভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ধড় থেকে খসে পড়লো। তাঁর রক্তস্নাত দেহের খানিকটা রক্ত ছিঁটে উঠে মায়লীর মুখখানাকে অতি ভীষণভাবে পৈচাশিক করে তুললো। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় মায়লী সুবেদারের ছিন্ন মুণ্ডটা চুল ধরে উঁচু করে তুলে মেজের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল।

ইস্, একি মানুষ—না রক্ত পিপাসু ডাকিনী! —জেঠা ভয়ে শিউরে উঠে ছুটে পালালো।

একটু পরেই জেঠা পিছনে ক্ষীণকণ্ঠের ডাক শুনতে পেল—জেঠা দাদু! আমিও যাবো পরছো।

জেঠার হঠাৎ মনে হোল—ও যেন মহা শ্মশানের মাঝ দিয়ে পথ চলছে। এর সীমাহীন প্রান্তর হতে রক্তলোলুপ প্রেতিনী যেন তাকে পিছু ডাকছে। জেঠা একটু থামলো না—একবার ফিরেও তাকালো না। প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মায়লী হাঁপাতে হাঁপাতে রুদ্ধ দুয়ারের সামনে এসে দাঁড়ালো।

একি! এখন কি ঠাট্টা তামাসার সময়? জেঠা দাদু! দুয়ার খোল, দুয়ার খোল বলছি। এখনি হয়তো কেউ দেখে ফেলবে। দুয়ার খোল—তোমার পায়ে পড়ি। —মায়লীর কণ্ঠ কান্নায় ভিজে উঠলো।

রুদ্ধ দুয়ার অন্ধকার ঘরে নিশ্চল প্রাণহীনের মত দাঁড়িয়ে আছে জেঠা। ভয়-বিস্ময়-ভরা উৎকট ঘৃণায় ওর মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। মায়লীর প্রতি সীমাহীন বিতৃষ্ণায় ওর মন ভরে উঠছে। এই কি তার লীলা-সঙ্গিনী? —দূর দূর—একে মানুষ বলে ভাবতেও জেঠার মনে এখন সংশয় লাগে। দরজা খোলা তো দূরের কথা, জানলাটা খুলে ও আর ওর মায়লীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। জানলাটা খুললেই হয়তো ও দেখবে—রক্ত ছিঁটায় চিত্রিত মায়লীর সেই ভয়ঙ্কর মুখ, আলুথালু কেশ, হাতে রক্তাক্ত সেই ভোজালী খানি। শুধু হাতেই পান-খর্পর নেই।—উঃ, চিন্তা করতেও গায়ে কাটা দেয়। জেঠা ভয়ে চোখ বুজলো।

জেঠা দাদু! খোল, খোল—দোর খোল। —দুয়ারে

CENTRAL LIBRARY
শারদীয়া আলেখ্য

আঘাত করতে করতে মায়লী কেঁদে ফেললো

এদিকে ঝড়ো গুমট ভেঙে বাতাস ক্রমশঃ জোরে বইতে লাগলো। বৃষ্টি-বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দের সঙ্গে মায়লীর নাকিসুরের কান্না মিশে বাইরের পরিবেশটা দেখতে দেখতে যেন অট্টনাসিক হয়ে উঠলো।

বাড়ির ভেতরে ঘরে মানুষের কাশির শব্দ শোনা গেল যেন। না না না—এমন করে থাকাতো ঠিক হচ্ছে না। জেঠার চেতনা আবার ফিরে এলো। অনমনীয় কঠোরতায় ওর দেহ সহসা ঋজু হয়ে উটলো। জেঠা জানলা খুললো। মায়লী ছুটে এসে জানালার ধারে দাঁড়ালো। জেঠা দৃঢ়কণ্ঠে বললো —মায়লী, আজ দুয়ার খোলার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম, তোমার সঙ্গে বস-বাস আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার মধ্যে এতদিন যে মায়লীকে আমি ভালবেসেছি, তার এখন সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়েছে; সেখানে আজ যে জন্ম নিয়েছে, তাকে আমি ভয় করি। ভয়ের জায়গায় ভালবাসা কোথায়? বিশ্বাসও অসম্ভব। ...মায়লী, তুমি আমায় ক্ষমা কর—ঘরে যাও।

মায়লী বিস্ময়ে কিছুটা সময় স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললো—তুমি এসব কি বলছো, জেঠা দাজু? আমি এর মাথা মুণ্ড, কিছুই বুঝতে পারছি নে। ঠাট্টা ফাজলামো রাখ—দুয়ার খোল, খোল দুয়ার—

যা বলছি, ঠিকই বলছি। এতে এতটুকু ফাজলামো নেই। —ধীর কণ্ঠে বললো জেঠা।

কি ঠিক বলছো? তোমাকে সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলতে হবে। আমার ভেতর তুমি ভয়ের কি দেখলে? ...না, না, না—আমাকে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। —মায়লী কঠোর কণ্ঠে বললো।

তোমাকে কি ফাঁকি দিলাম, মায়লী? তুমি আমাকে দেখার জন্ত ডেকেছিলে। আমি তো তোমায় দেখা দিয়েছি, —আর কেন? বাড়ি যাও, বাড়ী যাও—এখন বাড়ি যাও, মায়লী। —জেঠা জানলাটা বন্ধ করতে চাচ্ছিল।

মায়লী সিকের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে জেঠার বাঁ হাত খানা খপ্ করে ধরে ফেললো। তারপর ও উত্তেজিত ভাবে বলতে লাগলো —ভালবাসার লোককে দেখা কি এত শীগ্-গিরে শেষ হয়, জেঠ গুরুং? তোমাকে দেখার আরা অনেক বাকি। তোমার জন্ত আমি পথে নেমেছি। এ-পথের শেষ না দেখেই বাড়ি যাব? হ্যাঁ, বাড়ি যাব; সে বাড়ি যমের বাড়ি। প্রয়োজন হলে, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। ও বাড়িতে যে ভালবাসার লোকের হাত ধরে যেতে হয় গো! —মায়লী সহসা পৈশাচিক হাসি হাসলো।

আবার আবার সেই ডাকিনী! রক্তাক্ত মুখে রক্ত-লোলুপ চাহনি। জেঠাকে যেন গিলে খেতে চায়। ওর গা আবার শিউরে উঠলো। বাইরে ঝড়ো হাওয়া বেশ দাপাদাপি সুরু করেছে। জেঠা কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত রইল। তারপর একটানে হাত ছাড়িয়ে ও চীৎকার করে উঠলো—পার-দেইনা, পারদেইনা,—তিমরো সাথ বসনু পারদেইনা। তিমি ডাকিনী তিমি ডাকিনী—মায়লী ছইনা।

জেঠা সজোরে প্রায় মায়লীর হাতের উপরেই জানালাটা বন্ধ করে দিল। অশেষ উত্তেজনায় জেঠা পাশের খালি চৌকিটার উপর বসে পড়লো। মায়লী একটা আর্তনাদ করে ওই খানেই বসে পড়ে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। দেখতে দেখতে পাইন দেওদার চাপের দেশে ঝড় নেমে এলো। অদূরে একটা গাছের ডাল মড়-মড় করে ভেঙে পড়লো। অশ্রুসিক্ত নয়নে উঠে দাঁড়ালো মায়লী। আহত বাঘিনীর মত ওই বন্ধ জানলাটার দিকে ও তাকালো একবার। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললো—বটে। এত অপমান! আমি ডাকিনী! —আচ্ছা।

বলেই সেই ভুটানী কম্বলখানায় সারা দেহ ঢেকে মায়লী এই ঝড়-জলের মধ্যেই ছুটে বেরিয়ে গেল। মাথার উপর জলভরা মেঘে বিদ্যুৎ বজ্র গর্জনে জ্বলে উঠলো। হয়তো বা কোথাও বাজ পড়লো। মায়লীর সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।.....

ভোর হতে-না-হতেই জেঠার ঘরের দরজায় ঘনঘন ভারী পায়ের আঘাত পড়তে লাগলো।

দরবজা আস্তি খোল, ছিটো খোল। দের হোনেছে কেওয়াড়ি ভাঙ্ দেগা। —খোল, তুরন্ত খোল। —টাউন দারোগা গর্জ্জে উঠলেন।

ওই আবার পদাঘাত! জেঠা তন্দ্রা থেকে সহসা যেন জেগে উঠলো। ও তাড়াহাড়ি দরজা খুলে দিল। একি সাড়া বাড়িটা আর্মড পুলিশে ঘিরে রয়েছে! উঠোনের ভেতর পুলিশ গিজ গিজ করছে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মায়লী দেখিয়ে দিল—এই সেই নরাধম, যে আমাকে আহত করে, আমার স্বামীকে খুন করে পালিয়েছে।

বলামাত্র দু'দিক থেকে দু'জন পুলিশ জেঠার দু'বাহু সজোরে চেপে ধরলো। কপাল লক্ষ্য করে টাউন দারোগা 'রিভল্‌বার' তুলে বললেন—এক পা নড়নেসে মর জায়েগা —খবরদার!

এবার জেঠার বুঝতে আর বাকি রইলোনা এবং বিস্মিত হয়ে দেখলো—মায়লীর হাতে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

আমাকে দেখার শেষ হতে তোমার আর কত বাকি, মায়লী?—উদাস কণ্ঠে জেঠা বললো।

মায়লী! কাহা মায়লী? এতা মায়লী কইপনি ছইনা। মায়লী মরগয়···মরগয়...হাঃ হাঃ হাঃ...হাঃ হাঃ হাঃ —মায়লী উদ্‌ভ্রান্তের মত হাসতে হাসতে ছুটে পালালো।

জেঠা গুরু, উঠিয়ে ভাইয়া! জজ সাহেব আগিয়া। —কোর্ট হাজতের লোহার দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন হাজত-সুবেদার। পিছনে তার জন চারেক আর্মড পুলিশ।

দু'হাটুর ভেতর থেকে মাথা তুলে জেঠা জাগলো—একটা স্বপ্নের দেশ থেকে ফিরে এলো ও; যেখানে প্রেমের তাজমহল অশ্রুর সাগরে নিঃশেষে ডুবে গেছে।.....

আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালো জেঠা গুরু। জজ সাহেবের এজলাস লোকে গম গম করছে।

মনমায়া ছত্রিনী, রাজ-সাক্ষী হাজির হ্যায়। মনমায়া ছত্রিনী... —অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী সুবেদার দিলবাহাদুর ছত্রীর হত্যার একমাত্র চোখে-দেখা সাক্ষীর ডাক হোল।

পচিশ ছাব্বিশ বছরের এক নেপালী মহিলা সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে হাজির হোলেন। নেপালী আভিজাত্যের ছাপ এঁর বেশ-ভূষায়। এঁর রূপে মেঘ-বিদ্যুতের চমক আছে। ভদ্রমহিলার চোখে মুখে কেমন-যেন বিভ্রান্ত ভাব। গভীরভাবে দেখলে এঁকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলে মনে হবে। এঁকে দেখে এজলাসখানা সহসা সজাগ হয়ে উঠেই একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেল।

ইস্! এই কয়েক মাসের মধ্যেই মায়লী কী সাংঘাতিক ভাবে বুড়িয়ে গেছে —সামনাসামনি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলো জেঠা।

মায়লী তাকালো জেঠার দিকে। কি সুন্দর সুঠাম দেহকান্তি! ওকে কি করে সে ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে দেবে? এ রকম লোক দস্যু হোলেও তো ফাঁসি দেওয়া যায় না। আর ও যে তার জেঠা দাজু, বড় আদরের জেঠা দাজু! দেখতে দেখতে সমস্ত অতীত চলচিত্রের মত মায়লীর চোখের সামনে ভেসে যেন খুলে ধরলো। ...না না সে কিছুতেই সাক্ষী দিতে পারবে না —এমন ভাহা মিথ্যা সাক্ষী। আর জেঠা দাজুর কি দোষ? ও তো তাকে দেখা দিতেই এসেছিল—তাকে আবার উদ্ধার করতেও চেয়েছিল। সে-ই তো ধৈর্য্যহারা হয়ে সুবেদারকে খুন করেছে। এ-বিষয়ে জেঠার সঙ্গে সে এতটুকু পরামর্শ পর্য্যন্ত করেনি। ওর অপরাধ ও তাকে ভালবাসতে পারেনি।

স্বামী ঘাতিনীকে কে ভালবাসতে পারে? সরকারী উকিল বলেছেন—আসামীর জীবন তার হাতের মুঠোর মধ্যে। একমাত্র তার সাক্ষ্যেতেই আসামীর ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। কি সর্ব্বনাশ! সে এখন কি করবে? মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সে সত্যি সত্যিই জেঠা দাজুকে যমের বাড়ি পাঠাতে বসেছে। —না সে কিছুতেই এই নিষ্পাপ দেবকুমারকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাতে পারবে না—কিছুতেই না; কিন্তু কি করে রক্ষা করবে?...

মায়লীর দু'গাল বেয়ে দরদর ধারে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সে আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ ঢাকলো।

ছি ছি—অমন করে কাঁদবেন না মনমায়া দেবী। হাজার কাঁদলেও আর আপনার স্বামীকে ফিরে পাবেন না ধৈর্য্য ধারণ করুন। জজ সাহেবের সম্মুখে নির্ভয়ে সত্যি কথা বলে প্রকৃত অপরাধীর শাস্তিবিধান করুন;—আপনার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে স্ত্রীর কর্ত্তব্য করুন। —সরকারী উকিল মায়লীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

গহন আঁধারে পথ-হারা পথিক সহসা যেন বিদ্যুৎ আলোকে তার পথ-রেখা দেখতে পেল। হাঁা, সে সত্যি কথাই বলবে—অতি নিষ্ঠুর সত্যি কথা। এতে যদি তার নিজের ফাঁসি হয়, তাতেও সে প্রস্তুত। সে নিজহাতে যে পাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত সে নিজেই করবে। মায়লী চোখ মুছে ধীরে ধীরে কাঠগড়ার দুটি সিক দু'হাতে শক্ত করে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে সঙ্কল্প-দৃঢ় কাঠিন্য তার চোখেমুখে ফুটে উঠলো।

উকিলবাবু, আমি প্রস্তুত। আপনি আরম্ভ করুন। —মায়লী দৃঢ়কণ্ঠে বললো।

বাঃ বাঃ—আপনি বীরপ্রসবিনী নেপাল দেশের মেয়ে। এই তো আপনার উপযুক্ত কথা। —বলেই সরকারী উকিল জজসাহেবের দিকে তাকালেন।

ইয়েস্, আরম্ভ করুন। —জজসাহেব সম্মতি দিলেন।

টেবিলের উপর থেকে সরকারী উকিল একখানা ভোজালী হাতে করে মায়লীকে বল্লেন—দেখুন, এই কুকরী খানা কার? —বেশ বুঝে-সুঝে উত্তর দিবেন কিন্তু। আপনার কথার উপর অপরাধীর সমোচিত শাস্তি বিধান নির্ভর করছে।

জেঠা গুরুঙের! —বললো মায়লী।

—বাঃ, বাঃ—বেশ, বেশ!

—এই কুরকীখানা দিয়েই জেঠা গুরুং আপনার ঘুমন্ত স্বামীকে হত্যা করেছিল?

—না।

সরকারী উকিল উত্তেজিতভাবে মায়লীকে জিজ্ঞেস করলেন—'না' মানে? আপনি আমার প্রশ্ন ঠিকমত বুঝতে পেরেছেন কি?

—পেরেছি

—তবে বলুন ঠিক করে, আপনার স্বামীকে কে খুন করেছে?

—আমি। —মায়লী অকম্পিত কণ্ঠে বললো।

সরকারী উকিল গভীর উত্তেজনায় টেবিলের উপর একটা কিল মেরে বললেন—আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? না ঠাট্টা তামাসা করছেন? এটা দায়রা আদালত, মানুষের জীবন-মরণের বিচারালয়। এটা ছেলে খেলার জায়গা নয়। মাথা ঠিক করে জবাব দিন।

সরকারী উকিল টেবিলের উপর আবার একটা সজোরে কিল মারলেন।

যতদূর মনে হয়, এখন আমার মাথা ঠিকই আছে; বরং আগেই ঠিক ছিল না, উকিলবাবু। —মায়লী ধীর কণ্ঠে বললো।

ছাই আছে—আপনি আপনার কথার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না, মনমায়া দেবী। আপনি অতি সাংঘাতিক কথা বলছেন। একমাত্র পাগল ছাড়া এরূপ উক্তি কেউ করতে পারে না। আমার সুদীর্ঘ ওকালতী জীবনে আমি সাক্ষীর মুখে এরূপ কথা শুনিনি। যা বলছেন, তাতে আপনার ফাঁসি হয়ে যেতে পারে! একথা কি একবার ভেবে দেখেছেন? —সরকারী উকিল বিরক্ত হয়ে বললেন।

তবু, তবু, একজন নিরপরাধী মানুষের মুক্ত হ'ক, উকিল বাবু আমার জীবনের সবসুখ, সব শান্তি চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে গেছে। আমি মুক্তি চাই—আমি মৃত্যুই চাই আপনাদের কাছে। দিন দিন আপনারা আমাকে মৃত্যু দণ্ড দিন। আমার পাপ জীবনের অবসান হ'ক—নির্দ্দোষ জেঠা গুরুং প্রাণে বাঁচুক। —মায়লী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে আঁচলে চোখ ঢাকলো।

হোপলেস!—পাগল, পাগল—বদ্ধ পাগল! পাগল ছাড়া এরকম কথা কেউ বলতে পারে?—বলেই সরকারী উকিল জজ সাহেবের দিকে নিরুপায় ভাবে তাকালেন।

শারদীয়া আত্রেয়ী

ইয়েস, আই থিঙ্ক সো—আমারও তাই মনে হয়। —জজ সাহেব সম্মতি জানালেন।

ধর্ম্মাধিকরণ, আমার বিনীত নিবেদন—সাক্ষীর ডাক্তারি পরীক্ষা সাপেক্ষ মামলা মুলতবী রাখা হ'ক। —সরকারী উকিল কাতরভাবে তাঁর আবেদন জজ সাহেবকে জানালেন।

ইয়েস, কেশ এড জারনড—মামলা মুলতবী রাখা হোল। —জজ সাহেব বললেন।

মনমায়া দেবী শুনুন। জজ সাহেব আপনাকে পাগল বলে মনে করেন। আপনার কোন কথা তিনি বিশ্বাস করেন নি। আপনি এখন কাঠগড়া থেকে নামুন। —চীৎআর করে বললেন সরকারী উকিল।

মায়লী ধীরে ধীরে এজলাস খানার চারদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকালো। তারপর বলতে লাগলো—আমি পাগল, জজ সাহেব ঠিকই বলেছেন। আমি প্রকৃতই পাগল। পাগল না হোলে আমি যা করেছি তা পৃথিবীর মানুষ কেউ করতে পারবে না। তা পারে একমাত্র অমানুষ—ডাকিনী···আমি ডাকিনী...আমি ডাকিনী...আমি পাগল... আমি পাগল... হা-হা হা...হা-হাঃ-হাঃ...

মায়লী পাগলের মত হাসতে হাসতে কাঠগাড়ার উপরে চলে পড়লো। পাশেই কোর্ট-পিওন দাঁড়িয়েছিল। মায়লীকে ধরে ফেললো। সরকারী উকিল ছুটে গিয়ে মায়লীকে ধরলেন। মায়লী জ্ঞান হারিয়েছে।

মায়লী, মেয়ো বইনী! —আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উন্মাদের মত চীৎকার করে উঠলো জেঠা।

হাসি ও অশ্রু

—শ্রীমঞ্জুশ্রী চক্রবর্ত্তী।

অরণ্যে ফোটে গোলাপের হাসিখানি
বায়ু চুমে যায় শিশির শুভ্রদল—
এরও চেয়ে যেন আরও ভালো লাগে মোর,
মৃদু হাসি সনে রাঙানো প্রিয়া-কপোল।
আকাশ ওপারে চলে যাওয়া মেঘমালা
ঘুম ভেঙ্গে গেলে স্বপনের ছেঁড়াতার
জোড়াতো লাগেনা
দুখ আনে অনিবার।
তারও চেয়ে বেশী ব্যথা জাগে মোর মনে
অশ্রু ঝরানো ব্যর্থ প্রেমের গানে।

মাদুলী

—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী।

আপ ডাউন দুটো ট্রেনই এখানে একসঙ্গে এসে দাঁড়ায়। দু'ট্রেন থেকে হড় হড় করে লোক নামে। গ্রাম থেকে যারা আসে তাদের বেশীরভাগ আসে মামলা মকোদ্দমা রেজেষ্ট্রিকরণ করার জন্য। ওরা বলে—কোর্টে যাবার হবে। ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে লাল কাঁকড়ের রাস্তা ধরে সবাই এগোতে আরম্ভ করে। কিন্তু কিছুদূরে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়।

একটা লোককে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই সপ্তরথীর মত। একটা টিনের সুটকেসের ওপর শুভ্রশোভিত সন্ন্যাসীর ছবি। সুটকেসের ভেতর থেকে একটা মাদুলী বের করে বলতে আরম্ভ করে—একটা ছোট ছেলে আন।

দর্শকদের মধ্যে যেন একটু হাওয়া বয়ে যায় ধানের খেতের ওপর দিয়ে যাবার মত করে। ছোট একটা ছেলে উসখুস করে ওঠে। ..সংগের বুড়োটা ঠেলে দিয়ে বলে—যানা ক্যান। ছেলেটা আবার বুড়োর দিকে চেয়ে ভয়ার্ত্ত হয়ে অদম্য কৌতুহলে সাহসে ভর করে এগিয়ে যায়।

—বস বাঁহাত দেখি।

বাঁহাতে একটি মাদুলি দিয়ে হাতটা আবার বন্ধ করে বুড়ো আঙুলে কাজলের মত কালি লাগিয়ে দেয়।

—এবার এক চোখ বন্ধ ক'রা কালির মাঝে দেখ।

ছেলেটা ডান হাত দিয়ে ডান চোখ বন্ধ করে রাখে।

—বাবা গুরুচরণ এদিক্ এ্যাস। কিছু দেখপার পাও।

—না।

—ভাল করে দেখ। লোকটা আবার বলতে আরম্ভ করে

—গুরুচরণ চোখ পরিষ্কার কর। দেখপার পাও।

—হ্যাঁ! বোধহয় একটু একটু দেখা যায়, মনে হচ্ছে যেন সত্যি সত্যি একটা লোক দেখা যায়। আবার ঝুঁকে দেখতে আরম্ভ করে নিঃসন্দেহ হয় সে।

—কী দেখা যায়।

—একটা মানুষ ঘাঁট আয়।

—গুরুচরণ চেয়ার নিয়া এ্যাস।

ছেলেটা দেখে লোকটা একটা চেয়ার নিয়ে এল। তারপর একজন সন্ন্যাসী এসে বসে।

—গুরুজী আসছে।

—হ্যাঁ।

—এমনি দেখপায়। সে কটোটা তুলে ধরে।

—হ্যাঁ, ছেলেটা স্বীকার করে।

—আচ্ছা এবার যাও। মাদুলিটা নিয়ে জিজ্ঞেস করে

—এবার দেখা যায় কিছু।

—না।

দর্শক অভিভূত হয়ে পড়ে মাদুলীর প্রত্যক্ষ গুণাগুণ দেখে। চঞ্চলতার সঙ্গে কিসফিসানি বেড়ে যায় তাদের মধ্যে। লোকেই আবার বলতে আরম্ভ করে—ইয়াৎ ফাঁকিঝুকি নাই বাবু। মা কামিক্ষের আশীর্বাদে আমার গুরু নাগানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ মানবের হিতার্থে এই মাদুলী বছরে একবার মাত্র দ্যান। দেওয়ার সময় আমারে কন, ত্রিনাথ অধর্ম্ম করিস না। মার আশীর্ব্বাদ লাভ কর। শুধু খরচের জন্য মাত্র স'পাঁচ আনা এর মূল্য। সর্ব্বরোগে আরোগ্য; শত্রুর দমন, মামলায় জয়লাভ, পরীক্ষায় পাশ মাত্র স'পাঁচ আনা। কন যদি কারুর দরকার থাকে, হাটি খিকা আজই চলা যাব আর পাবিন না। কন যদি কারুর দরকার হয়।

বেশ বিক্রি হয় অল্প সময়ের মধ্যে এই সর্ব্বাত্মক গুণসম্পন্ন মাদুলী। রোগে ডাক্তার অনেক নেয়, স'পাঁচ আনায় যদি মেটে মন্দ কী!

ভিড় পাতলা হয়ে এলে ত্রিনাথ উঠেপড়ে সুটকেস

শারদীয়া আর্কাইভ

শুছিয়ে। আবার গিয়ে বসতে হবে অন্য যায়গায়। সারাটা দিন এমনি করে ঘুরে ঘুরে গোটা দু'য়েক টাকা রোজগার করে আশায় বসে থাকা মুখ দু'টোতে তুলে দেবে একমুঠো মোটা চালের অন্ন। একই ভাবে সুর করে বলতে হবে—মা কামিক্ষ্যের আশীর্ব্বাদ, সর্ব্বরোগে আরোগ্য, শত্রুর দমন, মামলায় জয়লাভ, পরীক্ষায় পাশ। অবশ্য নিষ্ফল হবে না।

এমনি করে সে লোককে দিয়েই যাবে তাবিজ কবচ। নিজের রক্ষা কবচটি কোনদিন হোটাতে পারবে কিনা কে জানে।

অন্ধকারে দরজাটা ঠেলে ঢুকতেই আন্না চেঁচিয়ে ওঠে

—কেটা ?

—আমি।

ত্রিনাথ ঘরে ঢুকে চারদিকে চায়। শুক্লা চাঁদের যথেষ্ট আলো এসে পড়েছে ঘরে চালের আক্র ভেদ করে। সামনেই বর্ষা আসছে ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়ে ত্রিনাথ। আর সংগে সংগে মলিন বিছানাটার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

—লালু ক্যামন আছে, আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে।

—তেমনি এট্টু বেশী হবার পারে।

—খাবার দিছু কী ?

—শটী। এবার কিন্তু ডাক্তার না দ্যাখালি বাঁচপ না। কালই মনি ডাক্তারক্ নিয়া এ্যাস।

—আনমু। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ত্রিনাথের।

দিন পনের থেকে ছেলেটার জ্বর। কিছুতেই কমেনা, কী এক অশান্তির মধ্যে যে দিন কাটাচ্ছে সে কথা বলবার নয়। লালুর কপালে হাত দিয়েই চমকে ওঠে ত্রিনাথ। ওর কপালটা যেন আগুণে পুড়ে খা খা করছে ত্রিনাথের বুকের মত। কাঁথাটা দিয়ে বেশ করে ঢেকে ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে সে। বারান্দায় আন্না বসে আছে উদাস নয়নে, হয়তো চাঁদ দেখেছে কিংবা লালুকে চাঁদের যে বুড়ীটাকে দেখায়, যে সারাদিন চরকা কেটে চলে ঘর্ঘর করে, তাকে। কোথায় একটা পেঁচা ডেকে ওঠে ত্রিনাথের মনে হয় বুকের মধ্যে থেকে কে যেন ডেকে উঠল মা। আবার ঘরে এসে ঢোকে না লালু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। এতটুকু যন্ত্রণা নেই, প্রশান্ত ঘুম কিংবা নিঃশ্বেষ ক্লান্তি।

—আমাক্ ভাত দে।

—চল।

ভাত খেতে খেতে অনেক কথা মনে পড়ে ত্রিনাথের। কবে সেই যে ছোট্ট টিনের সুটকেসটা নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছে আজও তো শেষ হলনা।

—আচ্ছা আন্না, কথাটা বলতে সংকোচ বোধ করে সে।

—কী কও।

—না তেমন কিছু না।

—তবু কী মনে করছ' সিটা কও।

—কই, আবার গাঁয়ে ফিরে গেলে ক্যামন হয়। এ পোড়া শহরং প্যাট ভরে না।

—আবার যামু ? খুসীতে ভরে ওঠে আন্নার চোখ। নেমে পড়তে ইচ্ছে করে মনের অতলে, অনেকটা নামলে হয়তো এখনো খুজে পাওয়া যাবে সেই মাঠ, বিল, জঙ্গল। সবুজ ধান ক্ষেত দিনে দিনে সোনায় পরিবর্ত্তিত হয়ে শ্বেতশুভ্র জীবনে সার্থকতা লাভ করার সুস্পষ্ট চলমান ছবি। ত্রিনাথ ভাবে আটটার ট্রেণে যে লোকগুলো আসে তাদের কথা, কেমন একটা মাটীর গন্ধ তাদের গায়ে, তারা গ্রামের সরলতা মেখে আসে সর্ব্বাঙ্গে।

—কিন্তু লালুর যে অসুখ, যাবা ক্যামন করা।

—আমার যাদুনী ব্যাঙ্কাদি, স্যারা উঠপি ও, ঠিক স্যারা উঠপি।

—যাদুনীত ভাল হেবে। আন্নার চোখে অবিশ্বাস—না না ডাক্তার দেখাও।

ত্রিনাথ ভাবে সত্যি কি এ যাদুলীতে কেউ ভাল হয়না। তবে এত লোক নেয় কেন! দিনের পর দিন বিক্রি করে যায় তবুতো কেউ অবিশ্বেস করে না। যদিও মা কামিক্ষ্যে, গুরুদেবের কথা সত্যি নয় তবু, তবু মানুষগুলো কেন...মনে পড়ে সে যখন ছোট ছিল তারও একবার ভারী অসুখ হয়।

আর সে অসুখে এক ওঝার চিকিৎসায় প্রাণ নিয়ে যখন টানাটানি তখন ডাক্তারের ওষুধে সে যাত্রা রক্ষা পায়।

—হ্যাঁ ডাক্তার দেখামু, লালুরে মাদুলী দিমুনা।

—সিটাই ভাল।

হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল, বর্ষার বৃষ্টির মত। লাল রুক্ষ মাটী এবার মাখনের মত নরম হয়ে উঠবে। আর ত্রিনাথের রোজগার দিনের পর দিন নিম্নমুখী হয়ে চলবে মেঘের সংগে পাল্লা দিয়ে। বৃষ্টির দিনে কোথাও বসা মুস্কিল হয়ে পড়ে আর বসলেও তেমন লোক জমেনা। আয়া রান্নাঘর থেকে ছুটে চলে যায় ও ঘরে।

ফুটো চাল দিয়ে ঝরঝর করে ঝড়ে পড়ছে ভগবানের আশীর্বাদ লালুর গায়ে। বিছানাশুদ্ধ তাকে এদিকে সরিয়ে আনে আয়া। কিন্তু মেঘ যেন ছোট ছেলের মত বায়না ধরেছে, কিছুতেই বোঝেনা লালুর অসুখ। ক্রমশঃ জলের ছিটা পেয়ে চমকে ওঠে লালু। আয়া তার কপালে হাত দিয়ে শিউরে ওঠে। হাত পা কী রকম ঠাণ্ডা হয়ে লালু নেতিয়ে পড়ে। মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকে কড়কড়াৎ করে বাজ পড়ে কোথায়। আর সেই আলোয় আয়া দেখে লালুর মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে এসেছে। বারছু' হেঁচকি তুলে হাতদুটা মুঠো করে কেমন যেন করতে থাকে। আয়া ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। ত্রিনাথ ছুটে আসে তার চীৎকার শুনে।

—কী হছে রে।

—লালু কেমন করতিছে. শীগগীর ডাক্তার ডাক।

—না না ভয় নাই, মায়ের নাম কর।

গরম করবার জন্ত পা ঘষতে ঘষতে আয়া বলে—শিগ্‌গীর ডাক্তার নিয়া এ্যাস না হলে আমার লালু ম'রা যেবে।

—হুঁ।

একটা নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত ত্রিনাথ বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আজ মাত্র পনের আনা তিন পয়সা রোজগার হয়েছে, বার আনা দিয়ে এসেছে চালের দাম। এখনো নগদ পনেরটা পয়সা আছে তাতা ডাক্তার ডাকবে, ওষুধ আনবে, আরো কী, কী করা যায় পনের পয়সায়। একটা গোটা জীবন কেনা যায় না!

হাওয়ায় শুপুরি গাছগুলো উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করেছে। ত্রিনাথ নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থাকে। ভেতর থেকে আর একবার আয়ার চীৎকার ভেসে আসে। না সে ডাক্তার ডাকবে। বড় বড় বৃষ্টির ফোটা সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। সোজা এগিয়ে চলে সে মণি ডাক্তারের উদ্দেশ্যে। পকেটে ডান হাতটা ঢুকিয়ে পয়সা কটা মুঠো করে চেপে ধরে। পয়সাগুলো বের করে চোখের সামনে মেলে ধরে, একটা গোটা জীবন কেনা যাবে?

কেঁচোর মত চুপি চুপি ঘরে ঢোকে ত্রিনাথ। টিনের সুটকেসটার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। সুটকেসটা খুলে ফেলে ভেতরে হাত দেয়। কিন্তু সংগে সংগে হাতটা টেনে আনে যেন সাপের গায়ে হাত পড়েছে। সত্যি মাদুলীগুলো বড্ড ঠ'ণ্ডা। তারপর আস্তে আস্তে লালুর হাতে বেঁধে দেয় একটা মাদুলী।

—একি মাদুলী, ডাক্তার ডাকপানা।

—চমকে ওঠে ত্রিনাথ—না, দেখিস এতেই ভাল হেবে, ঠিক ভাল হেবে লালু। চোখ দুটো তার ছলছল করে।

—মাদুলিত কি কারুর অসুখ সারে।

হাতটা একটু কেঁপে যায় ত্রিনাথেরা তবু বেঁধে দেয়; সব সময় সারবার জন্ত কী মাদুলী দেয় কেউ? তারপর সুর করে বলতে আরম্ভ করে সে, কিন্তু গলার সুরটা কেমন অস্পষ্ট—ঠিক সারবে। মা কামিক্ষ্যের অপ্রাদেশ, গুরু নাগানন্দের আশীর্ব্বাদ, সর্ব্ব রোগে আরোগ্য, শত্রুর দমন, মামলায় জয়লাভ, পরীক্ষায় পাশ, শুধু খরচের জন্ত মাত্র স'পাঁচ আনা।

আত্মহত্যা

—শ্রীশম্ভু দাস মুখোপাধ্যায়।

আষাঢ়ান্ত দিনের বেলা কী যেতে চায়? একঘেয়েমি তাস্ আর তাস্। মাঝে মাঝে গল্পগুজব হয়তো ভাল লাগে—হাতের তাস্ গুলোকে সাজাতে সাজাতে মিনতি দি বিরক্ত স্বরে বলে উঠলেন।

লীনা সঙ্গে সঙ্গে সায়দিয়ে বললে—বেশ তো। হাতের খেলাটা হয়ে যাক'খন্।

রেবা পিট তুলে নিয়ে খুশী মনে প্রস্তাব করলে—অনেক জায়গা ঘুরেছেন ভারতীদি। ওঁকেই গল্প বলতে হবে।

রেবার কথা কাণে যেতেই বিগত দিনের এক স্মৃতি মনে পড়ায় ভারতীর মুখখানা অকস্মাৎ পাঙশে হয়ে গেল। সে নরম গলায় বললে—এক জায়গার কথা আর এক জায়গায় বলার স্বভাব যে আমার না ছিল তা নয়। তবে গল্প হতেই এমন বিপদ ঘটতে দেখেছি যা আপনারা ভাবতেও পারেন না। সেই জন্যে মনে মনে ঠিক দিয়েছি মরে গেলেও গল্প আর—।

সকলের কৌতূহল গেল বেড়ে। হাতের তাস ঝট্ পট্ ফেলে দিল।

রেবাই আবার আগ্রহে বললে—ওজর আপত্তি শুনছি না। অন্য গল্প না, ঐ গল্পটাই শোনাতে হবে।

নাছোড়বান্দা হয়ে ধরায় অগত্যা ভারতী আরম্ভ করল—উনি তখন বালুরঘাটে বদলি হয়েছিলেন। মাত্র ক' দিন হ'ল ওখানে গিয়েছি। বাসায় সাজান গোছান নিয়েই ব্যস্ত। একদিন দুপুরে একজন বেড়াতে, এলেন। দেখতে বেশ ছিমছাম। বয়েস হাবভাব অনেকটা এই মিনতিদির সঙ্গে মেলে। কথাবার্তায় বেশ গোছালো। বাজে কচকচির বালাই নেই। ব্যবহারটিও খুব মিষ্টি। এসেই এমন আলাপ আরম্ভ করলেন যেন কতদিনের জানা-শুনো। ছেলেদের কাছে টেনে নিয়ে টুকিয়ে টুকিয়ে আমাদের হাল হদিশ জেনে নিলেন। এটাসেটা কাজেও আমার খানিক সাহায্য করলেন। ওখানকার আবহাওয়া, সুবিধে অসুবিধের কথা অনেক জানালেন। দুপুর গড়িয়ে গেলে বাড়ী গেলেন। সত্যি কথা বলতে কি আমার মনে হল এত জায়গা ঘুরেছি এমন আপন করা মানুষতো কোথাও দেখিনি। মায়ের পেটের বোনের চেয়ে বেশী। এর পর হতে প্রায়ই আমাদের বাসায় এসে সংসারের নানান কথা কইতেন, গল্প গুজব করতেন। একদিন কথায় কথায় আমায় বলে ফেল্লেন—তোমার সংসারের শ্রীছাদ দেখে মনে মনে হিংসে জাগে। তবু তো বাসা বাড়া। আমার নিজের বাড়ীতে চল বে দিকে তাকাবে অবরজঙ্গ হয়ে আছে। তাছাড়া তোমাদের দু'জনে যা মিল—কপোতে কপোতী। আমার জীবনটা খাক্ হয়ে গেল। সংসারের সুখ শান্তি সব বাসি হতে বসেছে। তাইতো স্থির থাকতে না পেরে টো টো করে বেড়িয়ে বেড়াই।

এমন কেন? —শুধালাম।

ম্লান ভাবে বললেন—মানুষ যা চায় তা পায় না, যা পায় তা চায় না। আমার কথা আর শুনতে হবে না। বরং তোমার কথা কিছু বল। তোমাদের সুখ দেখেই আমার সুখ।

বলতে বলতে তাঁর দুগাল বেয়ে জলের ধারা নামতে লাগল। রকম সকম দেখে প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলাম। পরে তাঁর মনটা ঘুড়াতে আপন কথা, পাড়লাম—আমাদের বিয়ে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! দিদি মরল আমার বিয়ে হল।

সোজরে? —কোন রকমে মুখ খুলে বললেন তিনি।

না,—মনে করুন রাতে দিদির বিয়ে হবে।

বাড়ী ভর্ত্তি লোক। মেয়ে পুরুষ সবাই কাজে ব্যস্ত। দিদি কোন ফাঁকে কী করেছে কে জানে? মাসীমা ছাদ হতে হটাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—অরুণা কেমন করছে। ডাক্তার ডাক্তার। সবাই ছুটলো ছাদে। দেখতে দেখতে আশ-পাশের লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল বাড়ী। ডাক্তার এসেই বললেন—এক্ষুনি হাঁসপাতালে পাঠান। এ নিশ্চয়ই এ্যাসিড খেয়েছে।

যে বাড়ী এতক্ষণ আহ্লাদে ডগমগ করছিল। ডাক্তারের কথায় বিষাদের ছায়ায় ঢেকে গেল। হাঁস-পাতালে যাওয়া মাত্র দিদির হয়ে গেল। ওদিকে আরও একটা কাণ্ড ঘটলো। শুনলাম আমাদের পাড়ার রমেন দারও নাকি একই অবস্থা। হাঁসপাতালের পথেই তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছে। একসঙ্গে দুজনকে চিতায় তোলবার ব্যবস্থা হল। চিতায় তোলবার সময় দিদির ব্লাউজের ভেতর হতে বেরিয়ে এল এক চিরকুট। লেখা ছিল—আমাদের ভালবাসায় দাম কেউ দিল না। সকলেই ভুল বুঝলো। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

এইনা পড়ে দাদা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। উত্তেজিত হয়ে মা, বাবাকে যা না বলবার তাই বললেন। রমেনদার মা, বাবাকেও ছাড়লেন না। রাগের মাথায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—সবচেয়ে দোষী আপনারা। এখন আর কাঁদলে কী ফিরবে? আপনাদের টাকার খাঁকতির জন্যেই—। আইনের আওতায় না পড়ায় প্রাণে বেঁচে থাকবেন কিন্তু আমরণ চোখের জলে টাকার লোভের খেসা-রত দিতে হবে।

রেবা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বলে উঠল—ভদ্র ভাষায় বেশ শুনি-য়েছেন। আমি থাকিলে অর্থ পিশাচদের দেখতাম একবার।

ভ্রু কুঞ্চিত করে তিক্ত কণ্ঠে মিনতিদি জবাব দিলেন—কী আর করতে? অর্থই অনর্থের মূল। টাকা টাকা করে এদেশে বিয়েতে এমন কত ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। কেউ কী কিছু করতে পারছে? এখন বক্‌বক্ না করে ভারতীকে কথা শেষ করতে দাও।

এক মুহূর্ত্ত পরে ভারতীই আবার নীরবতা ভাঙ্গল—কিছুদিন বাদ আমার শ্বশুরই এলেন বাবার কাছে। সরা-সরি বললেন—ভারতীকে আমি ছেলের বৌ করতে চাই। আজকালকার ছেলে মেয়েদের যা ব্যাপার, তাই সাতপাঁচ ভেবেই এই প্রস্তাব করছি। আশাকরি আপনাদের অমত হবে না।

আমার শ্বশুরের অবস্থা ভাল, বোলবোলাও কম নয়। চেনে না এমন লোক নেই। বাবা সেকেলে লোক। সব বুঝেসুঝেও কী ভেবে গরজী মতন ভাব দেখালেন। দাদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে উত্তর করলেন—একবার যা হয়েছে তা আর হতে দিচ্ছি না। বাবার মত আমরা করাবই—। আপনি সব ব্যবস্থা করুন।

তারপর উভয়পক্ষই না দেখলেন জাতকুল, না হল দেনা পাওনার কথা। কোথায় বা গলকঠাকুরের বিচার আচার? বাবার ক্ষমতা কোথায়? শ্বশুর মশাই যা খরচ খরচা কর-লেন ধুমধাম করেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। সময় সময় ভাবি দাদা না থাকলে কী হোত কে জানে?

আমি থামতেই তিনি বেশী ব্যাকুল হয়ে শুধালেন—দাদার নাম? কী করেন?

বললাম—উমানাথ চ্যাটার্জ্জী। এম, এ পড়বার সময় তাঁর কী যে হল আমরা কেউ জানতে পারলাম না। কত বড় বড় ঘর হতে বিয়ের জন্যে ঝুলাঝুলি। কিছুতেই রাজী হলেন না। বেশী পীড়াপীড়ি করায় আজও নিরুদ্দেশ হলেন কাশও হলেন।

মাথা নীচু রেখে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার দাদা কী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র? অনার্স ছিল?

উত্তর দিলাম,—হ্যাঁ। মনে হল শব্দটা অকস্মাৎ তাঁর মনে যেন জোড় ধাক্কা দিল। কেমন যেন কুঁকড়ে গেলেন। চোখ ফেটে আবার বেড়িয়ে এল জল। এই অবস্থা দেখে আমার মনে লাগল ভীষণ খট্‌কা। তিনিও চেষ্টা করলেন উঠে পড়বার।

শাঁখা সিঁদুরে বেঁচে থাক—বলেই উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সবাই।

ভালবেসে কেউ হাসে কেউ কাঁদে। পরেও কিছু জানতে পারেনি? —লীনা প্রশ্ন করল।

সে সুযোগ আর হয় নি। সেই রাতেই তিনি আত্ম-হত্যা—। করুণ বেদনায় ভারতীর গলা গেল আটকিয়ে। কথা শেষ করতে পারল না।

আমাদের আবেদন—

উদ্বাস্তুগণের দ্বারা পরিচালিত
কারখানায় তৈরী উৎকৃষ্ট মজবুত ও
দীর্ঘস্থায়ী টালী ও হাতে তৈরী

লোহার

সাজ সরঞ্জাম দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া
বেকার সমস্যার সমাধান করুন।

কর্ম্মকার ব্রদার্স

নিউমার্কেট, বালুরঘাট।

আধুনিক রুচি সম্মত পোষাক পরিচ্ছদ
সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে
কর্ম্মজীবনে সাফল্য এনে দেয়
নিখুঁত ও সুন্দর পোষাক
পেতে হলে
—আসুন—
সরকার ব্রাদার্সে

চৌরঙ্গী, বালুরঘাট।
প্রোঃ শ্রীপরমেশ্বর সরকার

মায়ের আবির্ভাবের সাথে
আমাদের
প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন।
জনসেবায় আপনাদের চিরপরিচিত
সতীশ-প্রেস
সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া নিয়োজিত আছে।
সুন্দর ঝকঝকে তকতকে
নির্ভুল ছাপাই ইহার বৈশিষ্ট্য।
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।
প্রোঃ—শ্রীনিখিলেশ সরকার।

বালুরঘাট।

জলযোগ

—জনপ্রিয় মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান—

খাড়িপাড়, বালুরঘাট।
শারদীয়া পূজায় আপনাদের পরিতৃপ্তির
জন্য আমরা আমাদের আধুনিক ও
অভিনব মিষ্টান্ন সম্ভারের ডালি
সাজিয়ে স্বাগতম্ জানাচ্ছি।
প্রোঃ—শ্রীমোহিনীরঞ্জন সরকার

সুটকেশ

—শ্রীকানাই দত্ত।

ঘরের কোনে ভাঙ্গা সুটকেসটা জঞ্জালের বাড়া হ'য়ে পড়েছিল। অনেকদিন থেকেই ওটার একটা গতি কোর-বার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু আলস্যের দরুণ পারিনি। তা ছাড়া কেমন যেন মায়াও পড়ে গিয়েছে ওটার ওপর। মায়া পড়তেই পারে। সেই কবে এক ভাদ্রের ভরা দুপুরে এক ভীরু কিশোর ভবিষ্যতের অনেক নরম স্বপ্ন আর দুর্মর আকাঙ্খা নিয়ে ঐ সুটকেস হাতে করে পাড়াগাঁ থেকে শহরে পা দিয়েছিলাম। তারপর কতকাল কেটে গেল। আজ এসে প্রৌঢ়ত্বের দরজায় দাঁড়িয়েছি। কচি রৌদ্রের সেই নরম দিনগুলোকে এখন আর স্মরন ক'রতেই পারব না। তবুও একের পর একদিন গুনে গুনে যে পথ ভেঙে আজ এখানে এসে পৌছেচি, সে পথের অনেক ধুলো কাদায় অনেক মণিমুক্তোর স্বাক্ষর সুটকেসের ভেতরে লুকানো আছে এখনো। মায়া পড়বে বই কি!

ছুটির দিনের সকাল। উঠতে উঠতেই আটটা বেজে গেছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ ক'রে। কি বিশ্রী এই পাকা ভাদ্রের স্যাতসেতে দিনগুলো। বাইরে বেরুতে ইচ্ছে করে না। সপ্তাহের একটা দিন ছুটি, তাও মাটি। শুয়ে বসে করিই বা কি। তার চেয়ে এই ভালো—সুটকেস-টারই একটা গতি করা যাক। সময় কাটবে আর একটা কাজও হবে। যোগাযোগটাও মন্দ নয়। ভাদ্রের প্রখর রৌদ্রের জীবনে যার কাজ সুরু হয়েছিল, ভাদ্রেরই ভিজে দিনে তার সব সারা হয়ে যাক্।

সুটকেসটা খুলতেই একটা অদ্ভুত ধরণের গন্ধ এসে নাকে ঢুকলো। ঠিক কেমন গন্ধ—কিসের গন্ধ বুঝিয়ে ব'লতে পারবো না। ন্যাপথলিনের সঙ্গে পুরোনো কাগজের —মরচেধরা লোহার সঙ্গে, বদ্ধ বাতাসের একটা মিশ্র গন্ধ, সব মিলিয়ে কেমন যেন নিঃশ্বাস আটকে যায়। কেন যে এতদিন এই নোংরা জিনিষের সুটকেশটা ভর্তি ক'রে রেখেছি —ভেবে বিরক্তি লাগছে নিজের ওপর। আচ্ছা,—এই পাগলামির কোন মানে হয়। এই যে একটা 'ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটি' থেকে কেনা কাপড়ের 'ক্যাশমেমো'—এটা কিসের জন্য জমিয়ে রাখা হয়েছে! কোন কাজে লাগতে পারে এটা! আমরা কত বাজে জিনিষই না অযথা জমিয়ে রাখি। এ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমাদের এমন পেয়ে বসে যে বিচার বিবেচনার সময় পর্য্যন্ত দেয় না।

একগাদা বাজে, ছেঁড়া খোঁড়া ময়লাধরা কাগজের ওপর কী এমন মূল্যবান বিষয়ের স্বাক্ষর আছে যে এত যত্ন করে এতদিন তুলে রেখেছি। কোনে ওটা কি? সিগা-রেটের খালি টিন। আর এদিকে এগুলো? ছবির নেগে-টিভ। এককালে ছবি তোলার বদঅভ্যাস ছিল বটে। মনে প'ড়ছে এক সময় খেয়ালের বশে ক্যামেরা কিনেছিলাম একটা। বড় মেয়ের অসুখের সময় সেটাকে বিক্রী ক'রে দিতে হ'য়েছিল।

এ'গুলো কাগজের ওপর মুছে-মুছে যাওয়া কালিতে কী সব লেখা আছে একবার পড়েই দেখি না! নইলে এখনি সব পরিষ্কার করে যাবে—সময় কাটবে কী করে!

একটা চিঠি। ছেলেক লেখা মায়ের চিঠি। কল্যাণীয় অনীম ;

বাবাজীবন, অনেক দিন যাবৎ তোমার কোন খবর না পাইয়া যারপর-নাই চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ মাত্র কুশল সংবাদ দানে আমার চিন্তা দূর করিবে। মন দিয়া পড়া-শুনা করিবে। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তোমাকে আর অধিক কি লিখিব,—তুমি তো অবুঝ নও।"

এরপর কালি উঠে গিয়ে লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে —পড়তে কষ্ট হয়। পড়েই বা কী হবে। সে কোনো

বিস্মৃত দিনের কাহিনী। অসীম নামে একটী ছেলের কাছে মা চিঠি লিখেছিলেন—যে অসীম ছিল মায়ের একমাত্র ভরসা—যার জন্তে মায়ের হৃদয়ে উদ্বেগের অবধি ছিলনা। অসীম কি মায়ের আশা পূর্ণ ক'রতে পেরেছিল।

সে-মায়ের কী হ'লো ব্যর্থতায়, হতাশায় মৃত্যু কাতর চোখে বেদনা ছড়িয়ে মা বিদায় নিয়েছিলেন। সে অসীমই কী আর আছে। মা নেই—সে অসীমও আর নেই। আমি আছি কিন্তু আমার মা ছিল কি কোনদিন—আমার মা? ভাবতে আশ্চর্য্য লাগছে।

আমার জন্ম কোন মাতৃহৃদয় কোন এক দিন কেঁদেছিল। দুঃসহ ব্যথায় বিবর্ণ ঠোঁট আর বেদনায় নীল দু'টি চোখ দিয়ে মা কোন শিশুমুখের পানে তাকিয়ে স্বর্গসুধা পান করেছিলেন একদিন। সে মুখ কি আমারই ছিল?

আমার মুখ—আমারই মুখ কিন্তু এ মুখময়। তাতে কোন দুর্ভাগ্যের আকিবুকি ছিল না। কপালের চামরা পোড়া বেগুনের মত কুচকে ওঠেনি তখনো। তখনকার চোখের কোনে ব্যর্থতার কালি এমন করে লেপটে থাকেনি।

ছেলেবেলায় আমার কেমন দেখতে ছিল আজ তা কিছুতেই স্মরণ করা যাবে না এমনই হয়। যা পাই তার দিকে আমাদের চোখ পড়েনা! যা আমরা হারাই তার জন্ত কেঁদে সারা হই। তবুও ধরা থাক—ধরা থাক সুন্দর মাটির মত নরম মুখে উজ্জ্বল দুটো কালো চোখ কজ্জলের টানে ভেসে ভেসে বেরাত নদীর স্রোতে খ'সে পড়া ফুলের মত। আবার কখনো কখনো কাঁদের মুখের দিকে চেয়ে মায়ের বুকে স্নেহের সমুদ্রে জোয়ার আসতো হয়তো! আজ কত দিন হ'লো?

পুরানো খাতা একটা (ক+খ২ এর ফরমুলার কষা অঙ্কের খাতা। তার উপরেই আবার নানা রকমের হিজি-বিজি।—এক অপরিচিত হাতের লেখা,—"জীবনে বৈচিত্র্য নাই।" কার হাতের লেখা এটা? অবনীর,...অভিজিতের —অমলদার? মনে পড়ে না। কিন্তু সেই মনটা আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কি করে। সেই মন যার অনেক পাওয়ার আশা ছিল আর অনেক দেওয়ার,—আশাও ছিল অনেক বড় হওয়ার—যার একান্ত কামনা ছিল পৃথিবীর ধুলো কাদা ছড়িয়ে ওপরে ওঠার কিন্তু পারেনি। ধূলোয় লুটিয়ে কান্নায়, ব্যর্থতায় হতাশায়, হতাশ্বাসে লিখেছিলেন "জীবনের বৈচিত্র নাই।" আজও যেন তার সন্ধ্যায় পুকুরেরমত বিষাদাচ্ছন্ন চোখ দুটোকে স্পর্শ ক'রতে পারছি।

তারই পাশে আবার আমার হাতের লিখা কিন্তু বৈচিত্রময় মন আছে"। একথা আমি কি তাকে সান্ত্বনা দিতে লিখেছিলাম। অথবা সত্যি তার বৈচিত্রময় মন আমায় নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু যে মন জীবনে সক্রিয় হতে পারলো না তার বিচিত্রতার কী মূল্য আছে। হয়তো কোন উদ্দেশ্ত নিয়েই লিখিনি— লিখেছিলাম কেবল ভালো কথার পিঠে আর একটা ভালো কথা সাজাতে।

আর এক পাতায়,—"আজ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল যেন তীরে বসে এক অতল সমুদ্র দেখছি—যে সমুদ্রে অজস্র ঢেউ কেবলই ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায়। ও কনো কথা বলেনি, শুধু চেয়েছিল। কিন্তু ঐ চোখের দৃষ্টিতে কোন অমৃত মাখানো ছিল জানিনা —আবার মনে হচ্ছিল অমৃতস্নানে আমি যেন জ্যোতির্ময় হ'য়ে গেছি। আমি জ্যোতির্ময়। আঃ কী অপরিসীম তৃপ্তি, —কী অতলস্পর্শ শান্তি। আমি জ্যোতির্ময়। এরি নাম কী প্রেম।

নারীর প্রেমে এক পুরুষ আজ পূর্ণ হ'লো, আজ তার মৃত্যু ঘটুক। আমার মৃত্যু ঘটুক। এ-সমুদ্র হয়তো কাল আর দেখতে পাবো না। এমন ঢেউ আর ভাঙবে না। হয়ত অনেক বিষাক্ত সাপ ঐ সমুদ্র বেয়েই উবে আসবে—আমায় বিক্ষত করে দেবে। তারচেয়ে এই পূর্ণতার মুহূর্তে আমি মরে যাই। পূর্ণিমার পরদিনই আমাবস্তা এসে পূর্ণিমাকে স্মরণীয় করে দিক্।

কোনো মেয়ের চোখে চোখ রেখে একটি যুবক মৃত্যু কামনা করেছিল। কে সে মেয়ে। চামেলী। চামেলীর

চোখে সমুদ্র দেখেছিলাম। বিবাহের রাত্রে স্ত্রীর চোখেও তো সমুদ্রের স্বাদ পেয়েছিলাম। সে সমুদ্র কোথায় হারালো। কোনও এক সময় পুকুরের বুকে আকাশের ছায়া দেখেও তাকে অতলস্পর্শী সাগর মনে হয়। কিন্তু পুকুর তো সত্যিই সাগর নয়, তাই একসময়ে শুকিয়ে যায়। আকাশের ছায়াও সরে পরে।

না,—বতসব বাজে ভাবনা পেয়ে বসেছে। একে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বাইরে বৃষ্টিও কি ছাই থামবেনা ঘুরে কাশগাছটাকে ভিজে কাকেরমত জড়সড় মনে হচ্ছে—আর ছাদে ঠেকে যাওয়া মেঘকে নন্দলাল বসুর ছবির মত দেখলাম।

এক কোণে কয়েকটা কাচের গুলি পরে আছে। আর একট ব্যাডমিন্টনের ভাঙা বল। আমি নিশ্চয়ই গুলি খেলিনি কখনও। এত ছেলেমানুষ কোনদিন ছিলাম না। কে হয় তো লুকিয়ে রেখেছিল সুটকেশের ভেতরে। তারপর নিতে ভুলে গেছে। এমনো হতে পারে আমিই রেখেছিলাম কোন দিন। যাক্ ছোট ছেলেটাকে দেওয়া যাবে। খেলবে।

এই সিগারেটের টিনটায় কী আছে? আবদুল্যা ইমপেরিয়াল টুবাকু টিন। সেজমামা সিগারেট খেতেন খুব,—তার কাছ থেকেই টিনটা নিয়েছিলাম বোধ হয়। মারবেলগুলোকে ছেলেটাকে দিলে মেয়েটাতো কুরুক্ষেত্র বাধাবে। তার জন্ত কৌটাটা থাক্। কিন্তু ভেতরে কালো কালো গুঁড়ো এগুলো কী। চেনা যায় না, তবে সুতোয় বাধা কয়েকটা শুকনো ডাঁটা আর দু'একটা ভাঙা পাতা দেখে মনে হয় একটা ফুলের তোড়া লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এর ভেতর। একটা ছটো ফুলের পাপড়িও চেনা যায় যেন। পাড়াগাঁর মণিমালা বলে কোন মেয়ে কাকে যেন ফুলের তোড়া দিয়ে বিদায় দিয়েছিল একদিন, আর ছেলেটি ফুলগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিল সেজ মামার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া সিগারেটের কৌটায়।

ছেঁড়া—প্রথম ভাগ—ইতিহাসের কয়েকটা পাতা ছোট মেয়ের হাতের লেখাখাতা খবরের কাগজের টুকরো—সব সব জঞ্জাল। অজল সব। ওগুলো টেনে বের করতে করতে একটা ফটো পাওয়া গেল। চিত্রার ফটো। তার সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে আঁটা একটা চিঠি। চিত্রারই চিঠি!

ছবিটা ধুলো পড়ে পড়ে তামাটে আর অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ক্লিপের মরচা ধরেছে ওর একরাশ খোলা চুলে। তবুও চিনতে অসুবিধা হয় না।

মনে পড়ছে—একটু একটু ক'রে মনে পড়ছে সব। এই চিঠিই চিত্রার শেষ চিঠি—মানে আমার শেষবারের মত লেখা চিত্রার চিঠি। চিঠির সঙ্গেই ফটোটা ফেরত পাঠিয়েছিল, আমার তোলা ফটো. যার পেছনে আমারি হাতে লেখা ছিল,—"যে ছিল আমার স্বপনকারিনী"। সে লেখা এখনও আছে দেখছি।

মনে প'ড়ছে—মনে পড়ছে এ চিঠি পাবার পর থেকে চিত্রার সঙ্গে সব সম্পর্ক একেবারে চুকে গিয়েছিল। মনে প'ড়ছে সব।

৩রা মার্চ্চ

রাত্রি—১১৷৷০

অসীম,

ওপরে তারিখ আর সময় দেখে নিশ্চই ভেবে নিতে পারছ যে, তুমি চলে যাবার কিছু পরেই আমি এচিঠি লিখতে ব'সেছি। তাই অবাকও হচ্ছে এই ভেবে, হঠাৎ আমার এত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখবার প্রয়োজন হ'লো কেন। প্রয়োজন যে হয়েছে তা এখনি বুঝতে পারবে।

আমি এতদিন পরে অস্বীকার ক'রবনা যে আমি তোমায় ভালবাসিনি! অস্বীকার কোরবার দরকারও নেই। কিন্তু এটুকু জানিয়ে দিয়ে, তুমি আর আমার সঙ্গে কোন সংযোগ রাখার চেষ্টা ক'রোনা। রাখলে হতাশই হবে। অবাক হচ্ছ? হয়োনা। আমি হঠাৎ এসিদ্ধান্তে আসিনি।

তোমার প্রতি আমার দুর্বলতার মোহে আমি যতই জড়িয়ে প'ড়ছি, ততই আশঙ্কা হ'য়েছে তুমি বুঝি কাউকে

ভালবাসতে পার না;—বিশেষ কোন নারীকে। কেন এমন মনে হয়েছে, বলতে পারবো না। হয়ত তোমার স্বভাবের মধ্যে এমন কিছু ঔদাসিন্য ছিল,—চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু এলোমেলোমি যা আমাকে ক্ষুব্ধ ক'রেছে;—যদিও ও আশঙ্কাকে এতদিন খুব বেশী আমল দিই নি।

কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম আমার ধারনা মোটেই মিথ্যে নয়। ছাদের ওপর আমার কোলে মাথা রেখে তুমি চামেলীর গল্প ব'লছিলে তখন তুমি আমার মুখের দিকে তাকাও নি। দেখলে বুঝতে পারতে। কীই বা বুঝতে পারতে আর। তাই থাক সে কথা।

তোমার মুখ থেকে চামেলীর কথা শুনেই বুঝতে পারলাম কত দুঃখে, কত বেদনায় তোমার কাছ থেকে অবহেলা পেয়ে, সেই অভিমানী মেয়ে বিদায় হ'য়েছিল। অথচ সেই গল্প তুমি কত সহজেই না বলে গেলে যেন চামেলীর গল্প তোমার গল্পনয়—অন্য কারো। তাহলে এখন বুঝতে পারছ।

চিত্রা সেদিন বুঝতে পারেনি, প্রথম যে নারীকে ভালবাসা যায় তাকে আমরা এমন বড় করে দেখি যে তাকে নিয়ে সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে ঘর বাঁধা যায় না। চিত্রা সেদিন একথা বোঝেনি। আজ আর সেকথা ভেবে লাভ কী!

চামেলীকে আমি বঞ্চিত ক'রেছিলাম, তাই চিত্রা আমায় বঞ্চিত করেছিল কিন্তু সত্যই কী আমি বঞ্চিত হ'য়েছি। চামেলিকে চাইনি—চিত্রাকে পাইনি কিন্তু অন্য এক নারীকে তো পেলাম। সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে স্ত্রীকে পেলাম,—সাংসারিক ক্ষুদ্রতায় তৃপ্তও হ'লাম। হাঁ,

হলাম বৈ কি!

ভাবতে ভাবতে কখন অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছি জানি না। চমক ভাঙলো স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে—'কী গো, তুমি কি স্নান করতে যা'বে না নাকি? বারটা বাজতে চলল যে। আঃ কী ক'রছ তুমি! কাগজ কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে সারা ঘরটা নোংরা ক'রে ফেলছ। তোমাকে নিয়ে পারা গেল না। কাজে নেই কেবল অকাজে।

ভাবছি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সব ছেলে নিস্তেজ হ'য়ে আসে। আমার স্ত্রীর বেলায় দেখছি, সকলি উল্টো। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কথা বলার স্পৃহা ওর বেড়েই চলেছে। ক্লান্তি নেই, একবার আরম্ভ হ'লে কলের গানের রেকর্ডের মত একটানা চলল;—থামা নেই।

বললাম,—হ্যাঁ—এই যে যাচ্ছি। কাগজগুলো এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে দিই, কী বলো।'

—থাক ঢের হয়েছে। তোমায় কিছু ক'রতে হবে না। দয়া করে কেবল ওঠো দেখি। আমি ওগুলোকে এক জায়গায় জড় করে রাখছি। রাত্তিরে খুকির দুধ করার সময় কাজে লাগবে।

তাই বটে। ভুলে গিয়েছিলাম, এখানে—এই মানুষের সংসারের কিছুই ফেলা যায় না। এই বাজে কাগজগুলোর আগুনেও এমন উত্তাপ আছে, যাতে মেয়ের দুধ গরম হতে পারে। সুটকেশটাও কাজে লাগবে বৈকী। কাল ওটাকে রঙ করতে দিতে হবে!

বৃষ্টিটা এবার সত্যিই থামলো বুঝি।

লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কবি গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ "রাজকন্যা" পরিবেশক—সিগনেট বুক সপ

বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। শোধন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য—১৷৷৹ (সিগনেট বুক সপ এবং কবির কাছে প্রাপ্তব্য কলেজ স্কোয়ার)

কবিতা

পথ-চলা মানুষের কত পসরা—
জল, মাটি, ব্যোম আর বাতাস, খরা।
চলনের আঁকে বাঁকে বন্ধুতা সীমা আঁকে,
তারপর বর্বর বিকাশ-ঝরা।
সভ্যতা আসে শেষে দুখপসরা॥

বিকাশের নদী বয় পাঁচটি বাঁকে।
কৌম জীবন তার প্রথম তাকে।
দাসতা যে আসে ঘিরে বিষয়ের বুক চিরে,
সামন্ত ওড়ে শত ধনিক-বাঁকে।
সকলের শেষে ঐ সাম্য হাঁকে॥

ভাঙা-গড়া খেলা তার কালের বুকে।
রাষ্ট্র পুতুল গড়ে, ভাঙে সে সুখে।
তিনরঙা বাস তার বিধান, বিচার আর
নির্বাহ নিয়ে খেলে শিশুরা সুখে।
মহনে ওঠে বিষ সবার মুখে॥

ব্যক্তি দমন ছোটে সমাজরূপে।
সংঘের অধিকার রাষ্ট্ররূপে।
যন্ত্র দম্ভে মাতে ক্ষমতার অজুহাতে,
ব্যক্তি যে নিরুপায়, সংঘ যূপে।
মহুয় জগৎ আসে ঘর যূপে॥

বিধান সভায় শত আইন গড়ে ।
নির্বাহ ব'য়ে নেয় লোকের পরে ।
আইনের শৃঙ্খল পায়ে করে ঝলমল,
বাণীর ঝালর শোভে বিচার ঘরে ।
ওঠে তবু হাহাকার হৃদয়ে ঝরে ॥

নিয়ার বন্দী আজ হৃদয় খানে ।
পোড়ো মাঠে মাথা কোটে ঝড়ে ও বানে ।
আনাচে কানাচে জোটে রাজ্য তো! তার লোটে,
হাজারো রিগানে আরো বর্শা হানে ।
যন্ত্রী কাঁদে যে নিজ যন্ত্র টানে ॥

——

কবিতা

—অমল কৃষ্ণ গুপ্ত

ওরে পাগল কবি
মনের কোণেই থাকুক না তোর ভাল লাগার ছবি ।
বাইরে এনে তারে
সর্বজনের স্পর্শ দিয়ে সঙ্কুচিত করিস বারে বারে ।
লজ্জাবতী লতায়
আলো হাওয়ার স্পর্শ ছাড়া আর কোন তো
স্পর্শ নাহি চায় ॥
আমার কাব্য কেন প্রকাশ করি ?
সবার মনের গোপন কথার ঢেউ যে আমি ধরি ।
যদি কবি প্রকাশ নাহি করে
ঝর্ণা ধারার তরল মুখরতা
বন-বীথির মধুর চপলতা,
প্রতিদিনের সুন্দর যে দিত তোমায় ফাঁকি,
শুধু বাড়ি, শুধু গাড়ি ; রইত তবু বাকি
তোমার মনের গোপন ক্ষুধা ।
কাব্য সুধা
সেই ক্ষুধাটি করতে প্রতিহত
কবির রসভাণ্ড হতে ঝরছে অবিরত ।
সুন্দর যে প্রতীক্ষমান সাজে
ঐ অদূরে রাজে ।
হট্টগোলের কলরোলে
পাশ দিয়ে তার যাও যে চলে
দেখেও দেখ না কো ।
কবি গড়ে তাই হৃজনের সাঁকো ।
যে কথাটি বলতে নাহি পারো,
যে ব্যথাটি বাগ মানে না কারো,
যে মাধুরী বধূর অধর কোণে
মিলিয়ে যাবে বিস্মরণের ক্ষণে

সে সকলি পড়বে বাঁধা কবির লেখনীতে,
যখন খুশি যেমন খুশি পারবে তুলে নিতে।
পদ্ম যখন রইবে না আর নিঠুর শিশিরঘাতে
পদ্ম পাবে কবির কবিতাতে ॥

ওরে পাগল কবি
জগত জুড়ে অসুন্দরের ছবি।
ডাষ্টবিনে খায় অন্ন খুটে ভিক্ষাজিবির দল,
পদ্ম দেখার সময় কোথা বল ?
ফুটপাতে আর চত্বরেতে উদ্বাস্তুর ভীড়
কোথায় তাদের স্বপ্ন গেল, কোথায় গেল নীড় ?
জীবন যুদ্ধে ছুটছে সবাই ডেলি প্যাসেন্‌জার,
ঝুলছে বাসে, দুলছে ট্রামে সময় আছে কার ?
এ সংসারে সুর জমে না, সকলি চীৎকার ॥
সত্য কথা, তবু বলছি শোনো,
ভিখারী তো চিরকালই ভিখারী নয় কোনো,
সেও তো চায় গড়তে আশা
গড়তে ভালবাসা,
নূতন কাপড় পরতে পেলে আনন্দে উচ্ছল
তারও চোখে জল।
মলিন যতো বাস্তুহারার দল
তারাও দেখি গড়ে ঠাকুর, গড়ে গানের দল।
ঐ যে তোমার ডেলি প্যাসেন্‌জার
বিয়ের রাতে তারই কী বাহার।
নোতুন জামা, নোতুন কাপড়, গায়ে গন্ধ ঢেলে
একটি রাতের আবুহোসেন, প্রাণের আলো জ্বেলে।
সুন্দরকে দেখতে হবে, না দেখলে পর
কে জাগাবে নূতন দিন
কে বাজাবে নূতন বীণ
মানস মুকুল কে ফোটাবে সহস্র অন্তর ?
ধুলোয় গড়া এই বসুধা
কে করবে সুধায় সুধা
বালির রাজ্যে কে বহাবে ব্যাকুল নির্ঝর ?
পথ আলাদা, মত আলাদা, একটি কথা খাঁটি
সবাই আমরা চাই কিন্তু মনের মতো মাটি।
সেই চাওয়াতে ফুল মিতা, মিতা চাঁদের আলো,
মিতা পাখীর কলধ্বনি, মিতালি বাড়ালো
মনের, বনের, গৃহকোণের প্রতিটি সুন্দর ॥

ভালো কাটা'র জন্য সর্বাগ্রে
যার নাম
তপনালয়
(টেইলার)
বালুরঘাট বাজার।
কাটার— এন, মৈত্র
(ভূতপূর্ব্ব কাটার কমলালয় ষ্টোর্স—কলিকাতা)

অশোক বিড়ি স্বাদে, গন্ধে ও
ধূমপানে অতুলনীয়
অশোক বিড়ি ফ্যাক্টরী
প্রাচ্যভারতী রোড, বালুরঘাট।
অশোক বিড়ি পান
করে তৃপ্তিলাভ করুন

ভাগীরথী তটভূমি

—রাধামোহন মহান্ত

(১)

ভাগীরথী তটভূমি অতি উর্বর
প্লবমান জীবনের প্লাবন-পললে ! ...

পললের পরতে পরতে
প্রেরণার গুচ্ছগুলি স্বপ্ন দেখে প্রথম সূর্য্যের !
শত শত ছার্থ-জীবনের
বালুকণা জমে' জমে' জমা করে রূপোর-চাদর—
সদাগরী রাসলীলা অনায়াস—সমাজ-সম্মত ।
বৈষ্ণবীয় বিনয়ের অবতার—গাধা ভেঁড়া-দুম্বা ও ছাগল
পরকীয়া প্রেমে মত্ত, নিয়মিত পদরজঃ করে-যে সেবন !
অনেকের অনেক সাধুতা
গেরুয়ার অন্তরালে আদিম—স্বাধীন;
একালের সুধারার দিকেদিকে উৎসবের নূপুর সিঞ্জন ।

(২)

নদীর গতির সাথে সমান্তরাল
পীচঢালা বাঁধা রাজপথ—
বামে ডানে বহু-মাঠ পাশে ফেলে অবিরাম গতি
আরও কোনো রাজ্যের সীমায়
সীমানা হারিয়ে
উচ্ছাসম ছোটা-ছুটি, লোফালুফি চলে বহুতরো,
আমাদের হৃদয়ের মনগুলো ছুঁয়ে যাওয়া
চমকে-চটকে
একালের রকেটের সমজুটি সোমত্ত মেয়েরা
চিনি আমি, সদাগরী-সভ্যতার ওরা-যে সুধারা ।

শারদীয়া আত্রেয়ী

৩

ভাগীরথী নদীতটে কোন এক ডাকিনীর চরে
ভোর হলো রাত-জাগা প্রভাতী-তারার;
শ্রান্ত ক্লান্ত মুখখানি আরো স্পষ্ট
আমাদের বহুদেখা প্রিয়া সুধারার।
চোখে তার গভীর প্রত্যয়
নীড়-রচনার—
অবশেষে অনুপের অনুপম জীবনের গাছের মাথায়?
অনুরোধ বুদ্বুদগুলি
বাতাসের প্রশান্ত পাতায়
থেকে থেকে গুঞ্জরণ তোলে অস্ফুট,
কিছু শোনা যায়—
…বাঁচ্‌তে হবে…বাঁচাতে হবে…
এইতো নিয়ম…ছেলেখেলা নয়…
নবজাতকের আশা ও আশ্বাস…
জীবন সমুদ্র সফেন…তবুও সুন্দর…
—মনে হলো সবগুলো টুকরো টুকরো কথা
শাল আর দেওদার কাণ্ডের মতন
মাথা উঁচু ক'রে
শাখা-প্রশাখায়
পাঠালো বিজয়-বার্তা কামনার অগুরু সিঞ্চনে।

(৪)

সবগুলো টুকরো টুকরো কথা
সুধারার বুকের উত্তাপে
বনে বনে স্বপনের মেঘগুলো তাতিয়ে গলিয়ে
পুষ্পদলে জীবনের সঙ্কেত জাগালো।

এদিকে অনুপ বরফের মতোই শীতল!

সখ তার কুমার-জীবনে;
তবু কিন্তু জনকের ইচ্ছাগুলো গোপন সতেজ;
ব্রতে তার সংযত অনিচ্ছা।
তাই বুঝি কথাগুলি তার সুধারার কথার পেছনে
কঁকিয়ে কঁকিয়ে মরে
ভাগীরথী তীর্থতটে
খোঁচা-খেয়ে ফুল-ঝরা কাশের অঙ্কুশে।

(৫)

সদর চিকিৎসালয়ে জমা দেয় পাড়ার লোকেরা
জননীর লজ্জা-মোছা প্রথম-সূর্য্যের
চুমোয় উজল-করা একটি জীবন!
সুধারার ভারী ইচ্ছা—অনুপেরও দরদ অনেক,
পালিত পুত্রের ন্যায় পালে ঐ বাচ্চা ছেলেটারে।
চিকিৎসালয়ের দায় কেটে যায়—
মহাপ্রাণা সুধারার উদারতা প্রশংসার
জয়গান মুখে মুখে চারিদিকে প্রচারিত হয়।

ভাগীরথী তটভূমি অতি উর্বর—
বহুপ্রাবী জীবনের বৃষ্টি-ঝরা প্লাবন-পললে।

বিকল্প

—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

পুরানো দিনের শুখরাবো ভুলগুলি ;
হু হু করে এলো চৈতালি ধূলো ঝড়,
উড়ালো সে পাতা—চম্পক অঙ্গুলি
রেখেছ যেখানে আগ্রহে পর পর।

বলেছিলে তুমি, 'বৈশাখী আশা রাখো,
ভরা শ্রাবণের বিপ্লব বুকে বাজে ;
পারো আশ্বিনে পৃথিবী শস্যে ঢাকো ;
অম্লানি গান কৃত কর্ম্মারই সাজে।

...ান কিছুই, তবু চেয়েছিলে সব।
বলেছি, 'যে পাখি শূন্য গাছের ডালে—
কী সে দিতে পারে, আছে কি সে বৈভব—
মনের প্রদীপে আসমানী আলো জ্বালে!'

কতো দিন কতো উর্ণনাভের জাল
বোনাই হয়েছে, শোনাও হয়েছে ঢের
এমনি কাকলি—মায়ালোক কাব্যে,
শীতের কামনা ব্যর্থ করেছে কাল।

না-বলা কথার ফুরসৎ কোথা আর!
সময়ের জরী জাপটে ধরেছে গলা,
রিক্ত শ্রাবণে জীবন বৃহন্নলা;
হৃদয়ে সফেন চিন্তার পারাবার।

ঝড়-সমুদ্রে বিপন্ন মন-মাঝি,
আশার আলেয়া টানে গৃহ থেকে গ্রহে;
পরিপাটি কথা বলবার দিন নয়-এ;
শেষ সমারোহ মৃত্যু কি প্রেম—আজই।

———: (●) :———

সন্দর্শন

—শ্রীমানিক রায়

করবী প্রভাত থেকে, যাত্রা ক'রে, এলুম এখানে,—
এসে দেখি, সে দুয়োরে নির্বিকার তির্যক পাহারা।
দণ্ডিত কয়েদী বেশে কাল গুণি, অরব মননে।
বালিয়াড়ী আলিসায় শুধু দেখি উষর সাহারা।
ব্যাগ্রতা প্রতাপ দিয়ে করি ঢের বিনয় সাধনা—
বসন্তে বরফ গলে: দ্বারোয়ান স্বর্ণ চাবি তোলে,—
নিশ্চুপে নির্শ্বোক ছাড়ে: চোখে জ্বলে সজল কামনা।
তারপর মমতায় ফটকের দ্বার টেনে খোলে।

অবাক দু'চোখে দেখি, সমুদ্রের সুগভীর বুকে—
অগণন সোহাগী উল্কা ঝরে সেথা বিনম্র সোহাগে॥

———

শারদীয়া আত্রেয়ী

অন্তরা

—পরেশ সোম

আমাকে শোনাও গান, যে গানে অরণ্যের ঝড়
শান্ত হয়, তৃপ্ত হয় মনের ময়ূর;
জামবনে কচি রোদ, কালো রাতে নক্ষত্রের সুর
চাঁদোয়া দিক এঁকে ; মুছে নিক আঁধার কবর
আর কিছু রংচটা মনের পালিশ; তারপর
আষাঢ় আশ্বিন হোক—মেঘান্তরী দিন।
মেঘপুঞ্জ যাক উড়ে; সাহারা স্বপ্ন নিক, নিক বেহুইন
আরো কিছু তারুণ্যের সবুজ খবর।
বৃষ্টি-ক্লান্ত মন ভোলো অরণ্যের ঝড়॥

শোনাও একটী গান, যদি সেই বৈপ্লবিক গানে
দিবারাত্র বৃষ্টি-বন্দী এ-বিহঙ্গের প্রাণে
রামধনু স্বপ্ন আঁকে, রৌদ্রে হয় শাশ্বত মুখর
কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলি, আসে মুক্ত স্বচ্ছ সমীর,
কেঁপে ওঠে আম লিচু, কাঁপে কচি পাতার শরীর,—
কৃপণতা সাঙ্গ তবে। ছুটাছুটি পথের উপর
তুমি আমি করবই।
মেঘমুক্ত নীলকাশ। একফালি রোদ মুঠে ধরবই॥

রৌদ্র চাই। কিছু বৃষ্টি হয় যদি হোক
ধান্যশীর্ষে, অগণন বণভূমি প্রান্তরের বুকে
আবশ্যক যতটুকু, বৃষ্টি যেন তারপর কান্নার সামিল।
সমুদ্রের কন্যা মেঘ কেঁদে মরো বুকফাটা দুখে
ঝরাও নানান ফুল, বৃন্ত হ'তে কলি।
বলি তাই—'বন্ধ করো জলভারে ছলোছলো চোখ,
নয় সাহারা বা থরে গিয়ে করো ঢলাঢলি।'
এখানে রৌদ্র চ'ই—সূর্য্যের ঔরসজাত সোনালী মিছিল॥'

শারদীয়া আত্রেয়ী

তুমি গাও। বৃষ্টি থামে। রোদ একফালি
পশ্চিম দিগন্ত ঘেসে ছড়ায় সোনালী ॥

প্রথমে ও শেষে

—মানিক বল

জীবন কি শুধু ক্লান্তি জড়ানো ?
তা-না-হ'লে বল হাল্‌কা মোমের মতন কেবলি
একটু তাপেই মনের শরীর
আলোর ফুলটি ধরেনি যখনও
তখুনি সে কেন গলে ক্ষয়ে গেল ?

এ-নিয়ে তবে কি বেঁধেই রাখবো
তবু সাধ ক'রে এই ঘরটুকু ?
গলা-মোম নিয়ে আর কি কখনো
হীরে-ফুল-ফোটা দীপ জ্বালা যায় ?
যদি তা না যায় !
যদি তা না যায় কি ক'রে বাঁচবো ?

স্বপ্ন ? সেও তো ঘুমের ফসল
দু'হাতে কুড়িয়ে নেবার আগেই
খসে' পড়ে যায় অনবধানে।
আলোর আকাশ, আকাশের আলো
যেই সাবধানে ধরতে গিয়েছি
এক মুঠো রোদ পেলাম নাতো !

হাত খুললেই আলো এসে পড়ে

সাধারণ কথা প্রমাণ লাগেনা
তবু তো বুঝিনা কেন যে এমন
মুঠো খুললেই খালি হ'য়ে যায় আলোর আলো।
তোমাদের মনে ভোর হয় রোজ শান্তি—শিশিরে
আহা সেই ভালো। বলে রাখি শুধু
আমি তা পাইনি। আমার এখানে
দিনগুলো আসে গতানুগতিক—মানে নেই তার।
তোমাদের চোখে ফুল-পাখী-গান, সকালি-সন্ধ্যা এখনো আছে।
এখনো কি আছে? তাই যদি হয় আজ তবে কেন বল
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল?

আশ্বিনের সুর

—অসিত কুমার চক্রবর্ত্তী

আকাশ নির্জ্জন-নীল ঘননীল শীতের আকাশ
সহজ সোনার রোদ ঝরে পড়ে পৃথিবীর গায়
মনে মনে কতবার কতনামে ডেকেছি তোমায়
হয়তো হৃদয়ে তুমি কিছু তার পেয়েছ আভাস।
শিথিল শালের পাতা ঝরে যদি শীতের বাতাসে
তোমার মনের কোণে কারা যেন ছায়া ফেলে যায়
সোনার রোদের দিনে সেই মায়া নিমেষে মিলায়
তুমি যদি মেল মন আশ্বিনের এই নীলাকাশে।
ঘাসের শিশিরে রোদ কাঁপে কেয়ার পাতায়
সোনার রোদের ঘ্রাণ চিলের ডানায় এসে মেশে
হাল্‌কা মেঘের মত তাই চিল চলে আজ ভেসে
সহজ গানের সুরে তবুমন কে তার মাতায়।

শারদীয়া আত্রেয়ী

জটিল আমার মন, এই দিন দেখেছে কি চেয়ে
সহজ খুসির স্রোতে ভেসে যেতে চেয়েছে কখনো
একটি গানের কলি এমনি অবাক্ মনে কোনও
শুনেছ কি ? চলেছে কি সেই গান গেয়ে !

জিজ্ঞাসা

সাধনা সেন গুপ্তা

যৌবনের প্রাণ-শক্তি রক্তে রক্তে আনে উন্মাদনা
রুদ্ধ রোষে চিত্ত ঘোষে : সহিব না আর সহিব না—
এই যে অন্যায়, আর নিষ্ঠুর দুর্নীতি
এরে কভু দেবনা স্বীকৃতি; যে বিকৃতি
অষ্টবাহু অক্টোপাস সম ঘেরিয়াছে জীবনেরে
প্রতিদিক থেকে তাহারে করিব হত্যা ধারালো কুঠারে।

●

এই স্বপ্নে মুক্তি পায় অন্তরের একান্ত কামনা—
একে সত্য জেনে চলে তাই জীবন-সাধনা :
পার্ক-মিটিঙের ভাষণ শ্রবণে মিছিলের যোগদানে
লেখনীর মারফতে আর গরম 'ডিস্‌কাস্‌নে'।
এই-ই সব ? শুধু এই নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছ আজ
সংগ্রামী চেতনা ? আত্মহারা উত্তেজনা। শুধুতাই আজ
হাতিয়ার বিপ্লবের ? মানসিক দৃঢ়তার কোথা পরিচয় ?
কর্ম্মপন্থা-অনাস্থার, দলগত অনৈক্যের ঘটেছে কি লয় ?
দুর্জয় বিশ্বাসে তুমি করেছ কি অঙ্গীকার ভাই—
মানুষের ন্যায্য অধিকার অপনার প্রাণমূল্যে চাই ?

ক'নে-দেখা-আলো

—পরেশ নাথ ঘোষ

বড়লোকের একমাত্র ছেলে।
ভাবপ্রবণ,—বয়স বছর পঁচিশ।
বাপ মায়ের ভয়,—তাদের সুন্দর ছেলেকে
নিয়ে ত ঘটেই,
অর্থ নিয়েও কম নয়।
পাছে হাট বাজারে ঘোরাফেরা,
হাস্তে লাস্তে ফেটে পড়া,
ঠোঁটে রঙ মাখানো কোন মেয়ে—
বস করে তাদের ছেলেকে।
গিন্নি বলেন, 'বিয়ে দিয়ে দাও,
পাড়াগেঁয়ে লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে দেখে।'
কর্ত্তা বলেন 'সেই ভালো।'

ঘটক এলো—
সঙ্গে নিয়ে এলো, নানা দেশের নানা মেয়ের কথা।
তারপর।

তারপর হুগলী জেলার নাম না জানা ছায়ায় ঘেরা
একখানি গ্রাম।
একপাশে তার, তীরের আবর্জনায় পঙ্কিল হয়ে,
বয়ে চলেছে গঙ্গা।
পাড়ে গভীর ঘন জঙ্গল।
জঙ্গলের বুক চিরে এগিয়ে গেছে সরু মেটে রাস্তা,
মাঠ পেরিয়ে ইষ্টিসানের দিকে।
সেই গাঁয়ের পুরুত ঠাকুরের মেয়ে।
বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের মেয়ে।
দিঘির জলের মত টলটলে,—
অরণ্যের মত নিবীড় ও গভীর,—
লজ্জাবতী লতার মত স্পর্শ-কাতর।

স্থির হোল,—
মেয়ে দেখার যাত্রায় ছেলেকেও নিতে হবে সঙ্গে।
আজকালকার ছেলে,—তার ওপর ভাবপ্রবণ।

গাড়ী এলো ঘণ্টা দেড়েক লেটে।
সঙ্গে আছেন বাবা, মামা আর ঘটক ঠাকুর নিজে।
বনের পথ দিয়ে এগিয়ে চলেন তারা,
একটু আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টির কাদা বাঁচিয়ে।
ঝিরঝিরে হাওয়ায় সড় সড় করে বাঁশ ঝাড়।
কেঁপে কেঁপে ওঠে বনতুলসীর ঝোপ।
ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ে, কলকাতার
পাটকড়া পাঞ্জাবীতে,—
পালিশ করা এ্যালবার্ট জুতোয়।
পেছনে হাঁটে তাদের ছেলে,—
পঁচিশ বছর বয়স—ভাবপ্রবণ।

নজর পড়ে পাশের সান বাঁধানো পুকুরঘাটে।
গা' ধুয়ে উঠে 'আসছে একটি মেয়ে।
শ্যামলী তার গায়ের রং,
মেঘের মত চুলের রাশ।

তার, আশে পাশের সবুজ গাছের
মতই উচ্ছল।
চোখে তার আদিম লজ্জা,—
ভয়, যদি বনের পাখী
দেখে ফেলে তার যৌবন-সম্ভার!
আচমকা দাঁড়িয়ে যায় কলকাতার ছেলে,
বয়স বছর পঁচিশ—ভাবপ্রবণ।

ভট্‌চায মশাই লোক ভালো।
গরীব হ'লেও বোনেদী।
ব্যবহারে রুচির মার্জ্জনা আছে,
কৌলিন্যের ঔদ্ধত্য আছে।
নেই,—জাতকাঠে সস্তা রঙের মত
স্বভাব গাম্ভীর্য্যের ওপর অতি বিনয়ের পালিশ।
অবশেষে মেয়ে এলো।
লজ্জায় জড়ালো মিষ্টি হাসি চিক্ চিক্ করছে
চোখে মুখে।

দিন যায়।
হুগলী জিলার শ্যামলা মেয়ের শ্যামল রং
উজ্জ্বলতর হয়, কলকাতার কর্পোরেশনের জলে নেয়ে।
লাল টক্‌টকে সিঁদুরের টিপ্
পথ ছেড়ে দেয়, কাজল কালীতে নিখুঁত ক'রে আঁকা ত্রিশূলকে।
গড়িয়ে গেলো, আরও কয়েকটা উচ্ছল উদ্দাম দিন।
লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের লাজুক চোখ,
চক্‌চকিয়ে ওঠে লাস্যে।
পুকুরঘাটে জল নিতে দেখা মেয়েটিকে
'আবার দেখা যায় 'নাচ ঘরে' অথবা রেঁস্তোরায়,
'নিউ এম্পায়ারের ব্যালকনী'তে অথবা বোটানিক্যালের' তৃনকুঞ্জে,

বাবা দেখলেন,—
বাড়ন্ত গড়ন, মাথা ভর্ত্তি চুল, রংটা একটু কালো—
তাহোক, মন্দ নয়,—
ছেলে দেখলো,—
বর্ষণ শেষের মেঘ মুক্ত আকাশ,—
দুটী মাত্র তারা, বেশ উচ্ছল।
নীচে, সবুজ ঘাসের পাড়ওয়ালা মস্ত একটা দিঘি,—
যার কাঁচের মত টলটলে জলে,
নীল আকাশের, ঈশারা-ভরা, ওই দুটী তারার ছবি।
সেই মেয়ে,—সেই পুকুরঘাটে দেখা।

এক কথায় ঠিকঠাক।
বেজে উঠলো শানাই, বাঁধা পড়লো চাদরে
আর শাড়ীতে।
বাপ, মা ভাবেন, বাঁধা পড়লো তাদের
ভবঘুরে ছেলে,
লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের আঁচলে।

স্বামী বিহীন,—তবে পুরুষ বিহীন নয়।

সহরের লাজুক ভাবপ্রবণ ছেলে,
আজও খুঁজে বেড়ায়, তার প্রিয়াকে,—তার মানসীকে।
গ্রামে গ্রামান্তরে,—
যেখানে সূর্য্য ডোবে দিগন্ত রাঙা ক'রে।
যেখানে বাঁশপাতা সড় সড় করে,—
বনতুলসীর ঝোপ ঢেকে দেয়, পায়ে চলতি কাঁচা রাস্তা।
যে রাস্তা গিয়ে মিশেছে সেই সান বাঁধানো পুকুরঘাটে।
আবার কোনদিন তেমনি সন্ধ্যায়,—
যখন পশ্চিম আকাশে ঝলমলিয়ে উঠবে 'ক'নে-দেখা-আলো,
তার মানসী কি,
তেমনি ক'রে এসে দাঁড়াবে পুকুর ধারে ?
তেমনি ক'রে কি বনের পাখীর ভয়ে
লুকোতে চাইবে তার সযত্নে ঢেকে রাখা যৌবন সম্ভার ?
ভাবপ্রবণ ছেলে,—শুধু ভাবে—আর—ভাবে।

পলাতক

অসিত কুমার

অন্ধকারে অবিরাম ক্লান্ত আমি, কথা বলে বলে,
হৃদয় নীরব হ'ক মেঘময়ী রাতের হাওয়ায়—
ক্লান্ত আমি অবিরাম পৃথিবীতে পথ চলে চলে,
এবার সমুদ্র স্রোতে ভেসে যাব দূর দ্রাঘিমায়॥

দূরে যাক্ জন্মমৃত্যু, বয়ে যাক্ অনন্ত সময়—
চিররাত্রি বুকে বাজে অন্ধনীল সমুদ্রের স্বর,
অন্ধকারে শুনি যেন আকাশ পৃথিবী কথা কয়,
তারায় তারায় জ্বলে অজানিত কালের স্বাক্ষর॥

ভালবাসি ধরণীরে

শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস

ভালবাসি ধরণীর প্রতি অণুটিরে,
নিয়ত সোহাগ দিয়ে রাখিতেছে ঘিরে
আমার অন্তর।
রক্তিম রঞ্জিত উষা সুন্দর প্রহর,
আলোছায়া খেলে যায়—চঞ্চল পবন
নিয়ে আসে কুসুম সৌরভ দূর বন
কভু উপবন হ'তে।
ভেসে আসে কানস্রোতে
কত গান—কত ছন্দ চেতনাতে ঝঙ্কারিত করি :
জাগায়েছে সুপ্ত হিয়া। আমার অন্তর ভরি
পুলক উচ্ছ্বাস হানে সায়াহ্নের বর্ণালি গগন—
পাঠায়েছে কুটিরে আমার নিত্য আমন্ত্রণ
ঝিল্লীরব মুখরিত আঁধার রজনী।
স্তব্ধ হ'য়ে শুনি—
প্রস্ফুট কলিকা আর প্রকৃতি শ্যামল,
নিবিড় বনানী পার্শ্বে তটিনীর তরঙ্গ উচ্ছ্বল
কয় যবে কথা। যবে খরস্রোতা স্রোতস্বিনী
বেগে ধায় বাজায়ে কিঙ্কিনী ;
আর কত পত্র-পুষ্প নানা বর্ণে কুতূহলে চলে
আপনারে অর্ঘ্য সাজাইয়া, নিত্য জলে স্থলে।
এ'র ঋতুরাজি—
আসিয়াছে জীবনে আমার নব নব বেশে সাজি,
সুখ-দুঃখ দিয়ে রচা আমার জীবন-শিখাটি জ্বালালো।
অনন্ত বৈচিত্রময়ী এই ধরণীরে
বাসিয়াছি ভালো॥

এ বিপুল ধরণীর ললাটের পর
কত শিল্পী রেখে গেছে তিলকের লেখা
উজ্জ্বল ভাস্বর।
কত কবি গেয়ে গেছে মাধুরী মাখানো
চিরঞ্জয়ী গান,
আজিও অমিয় ধারা বহায়িছে প্রাণে
প্রেমের প্লাবন।
কত স্বর্গ-বিলাসীর দল দুলাইয়া গেছে
কর্ণে আভরণ,—
মাধুর্য্য-মঞ্জরী এর কণ্ঠে পরায়েছে
অমিয় ভূষণ।

* * *

আজি 'এর পদতলে বসি, ভাবি স্তব্ধ মনে—
কতকাল মিশিয়াছি সবাকার সনে
আদি যুগ হ'তে!
করিয়াছি খেলা কতকাল সম্পদে বিপদে;
মিটায়েছি ক্ষুধা আর প্রাণের পিপাসা
পিয়ে বারি, লভি আলো আর নব আশা।
অচ্ছেদ্য বন্ধনে মোর জড়ায়ে জীবন
মাতৃস্নেহে পালিয়াছে নিত্য অনুক্ষণ।
এ জীবন সার্থক করেছি—জন্মিয়াছি আমি
বিচিত্র ভুবন মাঝে। কেটেছে দিবস যামি
কভু পথে, কভু নদী তটে!
এ'র সাথে মিতালী করেছি—আত্মীয়তা বটে।
এ'র চির শুভ্র হাসি
বিদগ্ধ পরাণে অমিয় বহালো,
সুন্দরী পৃথ্বীরে তাই মাতৃক্রোড় হ'তে
বাসিয়াছি ভালো॥

ভজন

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার

...য় ও গো
অন্তর চারী।
...মার হৃদয় মাঝে
বাজাও বাঁশরী॥

ডুবাইয়া দাও মোরে
রূপ-প্রেম সাগরে
মাতায়ে আমায় তুমি
কর তোমারী॥

কৃপা করে কর মোরে
প্রেমের শ্রীরাধা
যার নামে ও মোহন
বাঁশরী সাধা

যুগ যুগ নিশি দিন
হে বধূ চির নবীন
সাধিয়া গিয়াছ তুমি
অব হেলি সব বাধা

হ'য়ে গেলে তব পুর
সুন্দর-সুমধুর
মিলন-মঞ্চেতে তব
তারে চির সাথী করি॥

ডেকে ডেকে বাঁশী সুরে
বেঁধেছ যে তুমি তারে
অফুরণ ভাল বাসায়
মোহন সে প্রেম ডোরে

তেমনি আমার হিয়া
লও টেনে আগাইয়া
দূর করি অবসাদ
মিটাইয়া সুখসাদ
ধন্য করে দাও মোরে
বুকে তব ধরি॥

রূপকথা

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

মেঘ সেচা নীল রাতের শিখার একা জাগি। শুধু আকাশে
হাসে ঘুম ভোলা চাঁদ। উতলা বাতাসও এলো বুঝি ওই।
স্বপ্ন নাও পুরানো হাওয়ার ঢেউয়ে দোল খায়,
মেঘ-পাল তোলে নিরুদ্দেশে—
স্নিগ্ধ-ব্যাকুল এই রাতে চোখে কেন ছলনার ঘুম জড়াও।
কথা রাখো সখি, ঘুম ভুলে খুলে দাও না রেশমী
কাজল চুল। বর্ষার মতো এলো মেলো করে ঢেকে
ফেলে ভীরু নরম বুক :
কিকে মেঘ-ছেঁড়া মিহি আলো এসে, আধো ভাঙা
চুলে হয়ে আকুল,
কেঁপে কেঁপে খেলে রূপ কথা নাকি ?—দেখি
দেখি, আহা ফেরাও মুখ।
কিশোর-স্মৃতির মনিদীপ হাতে এসেছে যখন
একটি রাত। বয়সের সব সংশয় রেখা মুছে
ফেলে সখি। ধরো দু'হাত।

শেফালী

শ্রীনিরঞ্জন বিশ্বাস

শেফালী, লজ্জা করে না তোর ?
এই দীন পৃথিবীর বুকে,
বারে বারে আসা কোন সুখে,
ভাল লাগে নয়নের লোড় ?

* * *

সুবাসে তোর মদির নেশা
কাটায় মনের ঘোর,
আগমনীর যে বার্তা আছে
প্রতিটি অঙ্গে তোর।

* * *

তাইত তোরে নিষেধ করি
আসিস্ না এ ভূ
নেশা যে মোদের টুটে যাবে
কাঁদব মোরা গোপনে।

* * *

মোর এ মিনতি যদি না রাখিস্
রাজপথে তবে তাকিয়ে থাকিস্।
দেখবি কত সাড়ী ব্লাউজের
পাখনা উড়ে সবে
নিষ্ঠুর দম্ভে চলে যাবে ওরে
মোদের ব্যাঙ্গ করে।

ব্যথার ভুবন (রবীন্দ্র স্মরণে)

—সুবল চৌধুরী

প্রিয়াকে ভুলবুঝি বোলেই, তার কথার কাকলিতে নিজেকে ভুলি
ব্যথাময় অস্থির ভুবনে যে যন্ত্রনা মোহ মরন নিয়ে আসে
সেখানেই ভুলবুঝে তাকে, ভালবেসে তাকে
আত্মরমণ করি;
সে কতোকাল আরো কতোকাল ধোরে তারে পাবো;
নীল চোখে ভাষা খুঁজে চোখরেখে চোখে তার
কতকাল নিজেকে ভুলবো; ঝরো ঝরো শাখায় ঝাউয়ের পাতায়
আত্মহারা হবো; জ্যোৎস্না কাঁপানো হাওয়ায় হাওয়ায় দেহ কার
ছায়া ছায়া ভয় ভয় মনে হয় কাঁপে থর—
সে দেহকার ? —
সে দেহকার ? — কোমল প্রাণ তার,
বন্ধু জানি, এ প্রশ্ন তোমার ; হৃদয়ের দেশে আসিবে অনিবার।
কিংশুকের রাঙ্গা ঘুম ভেঙ্গে দেবে এ প্রশ্ন তোমার বন্ধু তোমার।

রবীন্দ্র নির্ঝর-এ—মন শান্তি চাইনি অবলাপ্রেমে
হৃদয়ের গান যুঁই হোয়ে ফুটে ম্লান চোখে খুঁজেছে তাকে,
জানিবন্ধু জানি ফাঁকি সবই; মন যেওনা তবুও থেমে
উদ্ধত আশা গোপন থেকোনা, ঝড়ো হাওয়া মন তাকে,
নির্জনে ডাকো প্রান্তরছেয়ে, দিনগুলি ভাসে বকের মতন,
ধূ ধূ মাট, ঘুঘু ডাকা মাঠ তখন নির্জন হোয়েছে কেমন।

আধুনিক শিক্ষা-সমস্যা

—শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্ত্তী।

ঝরাপাতার ব্যথা-মর্ম্মর গানের শেষ রেশটুকু এখনো কানে করুণ হয়ে বাজছে—এর মধ্যেই ডালে ডালে কোমল কচি পাতাগুলি নবজীবনের সবুজ নিশান উড়িয়ে জানিয়ে দিল—আছে, আছে, আছে!

'আছে সেই প্রাণ আছে সেই গান
নবজীবনের আশা!
এইমত চলে চিরকাল গো—
শুধু যাওয়া আর আসা!'

এমনি করেই 'পুরাতন' মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আপনার চির-নবীনতা প্রকাশ করে—এই তো বসন্তের উৎসব!

পুরাতন বালুরঘাটও আনন্দে আজকে—হে নূতন,—নবজীবনের জয়ধ্বনিময় তোমার রথচক্রের ঘর্ঘর রবে ছুটে বেরিয়েছিল মৃত্যুর বসন্ত-উৎসবে। জরা সমাজকে ঘুনিয়ে ধরেছে, প্রথা অচল হয়ে পড়েছে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে' চেপে রাখতে চাইছে এমনি সময় বালুরঘাট "কাল্পনী"র চন্দ্রহাসের মতই একজন সর্দ্দারকে পেল যে দুঃখ-বিপদের তোরণদ্বারের মধ্য দিয়ে আমাদের বহন করে নিয়ে চলেছে—নূতন যুগের নব-বসন্তের হোলি খেলায়!

হে কিশোর,—হে কুমার,—বসন্তের কচিপাতায় যারে তারে এমনি করেই তোমার পত্র পাঠিয়ো, তোমার সে ইঙ্গিত গূঢ় বাণী ব্যর্থ হবেনা। —সে লিপির সম্মান বালুরঘাট রেখেছে—রাখবেও!.....

সমাগত সুধীসজ্জনমণ্ডলী, প্রিয় ছাত্র ভাইগণ ও প্রধান শিক্ষক মহাশয়—আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। উৎসবের আনন্দে আত্ম-বিস্মৃত হয়েছিলাম। প্রধান শিক্ষক মহাশয় অনুরোধ করেছেন আধুনিক শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হবে। সমস্যা বহু এবং বিচিত্র;—মানুষের মন এবং মানস যেমন বিচিত্র তেমনি শিক্ষাসমস্যারও অন্ত নেই। এমন দুরূহ জটিল আলোচনার ভার আমার উপর দেওয়ায় যে এলোমেলো এবং নীরস বাক্যজঞ্জালের সৃষ্টি হয়েছে তা' এই উৎসব-উন্মুখ সভার মাঝে পরিবেষণ করতে যথেষ্ট সঙ্কোচ ও আশঙ্কা হচ্ছে। তবে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের এই অত্যাচার যে আন্তরিক ভালবাসা প্রসূত এই ধারণাতেই বিপদ ঘাড়ে করেছি।

অতি শৈশবে যখন শিশুশিক্ষাহাতে শিক্ষার পথে প্রথম পা বাড়ালাম তখন মদনমোহন কানে মন্ত্র দিলেন —'জাড্য হোক দূর কর'! তাঁর দ্বিতীয়তাগ প্রসাদে মনের না হোক জিহ্বার জড়তা যে দূর হয়েছিল একথা আজও কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করি।

কিন্তু তারপর ক্লাশ থ্রি-তে যখন ইংরেজী এসে কণ্ঠে স্তর করল তখন জিহ্বার সেই সদ্য-দূরিত-জড়তা তো ফিরে এলই, সঙ্গে সঙ্গে মনের জড়তা নাশের ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকু পর্য্যন্ত চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেল। সেই থেকে কতকাল শিক্ষার পাকা সড়ক ধরে' একটার পর একটা পাশ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললাম কিন্তু যার সন্ধানে এতকাল অভি-ভাবক ও শিক্ষকের তাড়না এবং পরীক্ষার বিভীষিকা সয়ে, খাদ্য হাসি সব বিসর্জ্জন দিয়ে, রাত জেগে, বই মুখস্থ করে, স্লেট লিখে, বাপের পয়সা জলের মত খরচ করে' আধেক জীবন কাটিয়ে দিলাম তাকে পেলাম কৈ? সেই তো সমস্যা—শিক্ষার সব চাইতে বড় সমস্যা!

রাজা রামমোহন যখন এদেশে পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবার জন্য ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনে উৎসাহিত হয়েছিলেন তখন বোধকরি তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে আমরা এমনভাবে দেশভাষার পূণ্যবেদীতে পরভাষাকে আসন করে-জাতীয় চৈতন্যকে তার সামনে এমনি করে বলি দেব। জীবনের প্রভাতে যখন

মাতৃভাষার পরিচিত অঙ্গনটি বুদ্ধি-বিকাশের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন সেই সময়েই বাঙ্গালী সন্তানের সদ্য-জাগ্রত বোধ-শক্তি বহুরূপী বানান ও উচ্চারণ প্রকরণের গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে' বিদেশী ভাষার অরণ্যে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। সেই কচি বয়সে বিদেশীভাষা শেখানো আর দাঁত উঠবার আগে মাতৃস্তন্য ছাড়িয়ে মাংস পোলাও খাওয়ান একই কথা নয় কি? তারপর থেকে ইংরেজীভাষার দুয়ারে ঘা দিতে দিতে আমাদের চিত্ত হয়ে পড়ে ক্লান্ত, ব্যাকরণের সূত্র আর বানান চিবিয়ে চিবিয়ে চোয়াল ধরে আসে—এমনি করে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটিয়ে অবশেষে একদিন যখন ভাবরস গ্রহণ করবার যোগ্যতা এল তখন তা গ্রহণ করবার মত আগ্রহ আর নেই—মনে অরুচি ধরে গেছে!

অথচ এত সাধনার ফলেও ইংরেজী ভাষায় অধিকাংশ ছেলেরই কি চমৎকার দখল-এর তার অনেক হাস্যকর গল্পই আপনাদের জানা আছে। টেক্সট বুক পড়ে তার মর্ম্ম উদ্ধার করতে খুব কম ছেলেই পারেন বঙ্গিম ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নানাবিষয়ের মধ্য দিয়ে গল্পচ্ছলে নীতি শিক্ষার মতন নানাছলে ইংরেজী ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হয়। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে ছেলেদের না বুঝে গোটা বইখানাই মুখস্থ করতে হয়—এ যেন হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত ঘাড়ে করা! বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতার ফলে জ্ঞানের বিশল্যকরণী চির-কালই অজ্ঞাত থেকে যায়। ইংরেজী ভাষার দুর্ভেদ্য প্রাকার এখনি করে মনের সঙ্গে বস্তুর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ করে ফেলেছে।

আমাদের আধুনিক শিক্ষা আগাগোড়াই ছাচে ঢালা। বিদ্যালয় বললেই আমরা বুঝি ইটের পাঁচিল দেওয়া, টেবিল বেঞ্চি সাজান পাঠাগার নামধেয় কারাগার। সেখানে টেক্সট বুক কমিটি নির্ব্বাচিত ঝুড়ি ঝুড়ি বই ছেলেদের হাঁ করিয়ে গেলান হয় তা সে গুরুভার তারা বহন করতে পারুক আর নাই পারুক্। সিলেবাস্-রূপ বাৎসরিক খানিতে সব ছেলে-কেই একই তালে একই চালে চোখে ঠুলি বেঁধে ঘুরতে হয়। কোন্ ছেলের কোন দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক তা' দেখবার কোন প্রয়োজন নেই—যেন ক্লাশ জিনিষ বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন বিভিন্ন বালকের সমষ্টি গড়পড়তা কথা কাল্পনিক বালকের সমষ্টি মাত্র মনকে এরকমভাবে অবজ্ঞা করে' তাকে কলের যে কী শোচনীয় পরিণাম তা' আমাদের দেশের যে শিক্ষাভিমানী ছাত্র সংসারে প্রবেশ মাত্রই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। কোন একটা কি দুটো বিষয়ে অপরিপক্ক বলে শিক্ষায়তনের দুয়ার কত বালকের কাছে চিরতরে রুদ্ধ থেকে যায়।

আমাদের শিক্ষা জীবনে পরীক্ষায় পাশ করাই কৃতিত্বের একমাত্র নিদর্শন এবং সেই পাশের দরুণ এঁটে বউ বাজার কিম্বা বড় বাজারে যত বেশী দরে বিকোতে পারা যায় বিদ্যার বাহাদুরী ততটাই! সুতরাং "আবৃত্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী" এই মহামন্ত্র জপতে জপতে যে যতটা পারি গলাধঃ-করণ ও উদ্গীরণরূপ মুষ্টিযোগ অভ্যাস করে' পরীক্ষার বেড়া-গুলো একে একে ডিঙ্গিয়ে কোনক্রমে একবার শিক্ষামন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই জীবন সার্থক জ্ঞান করি। নিজেদের এই 'পুঁথি পড়কে তুতি হুয়ো'-র শিক্ষার কথা যখন লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করি তখন শিক্ষার প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা জাগেনা। "যথা খরশ্চন্দনবাহী ভারস্যবেত্তা ন তু চন্দনস্য"—আমাদের দশাও হয়েছে তাই! শিক্ষা আমাদের মুক্তি দেয় না,—শিক্ষার হাত থেকেই আমরা মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্ করি। তাই পরীক্ষার বিভীষিকা কাটিয়ে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্যই হয়ে পড়ে মগজের থেকে বিরাট শব্দের স্তূপ ঝেঁটিয়ে ফেলে মাথাটাকে যথাসম্ভব হাল্কা করা।

আজ এই কথাটাই আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে বিদ্যালয় মানে কেবল বই পড়ার যন্ত্র নয়; সে এমন একটা জীবনের ক্ষেত্র যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সম্পূর্ণভাবে বেড়ে উঠ্‌বার একটি আদর্শকে লাভ করবে।

আপনারা জানেন ইন্দ্রিয় বোধের উৎকর্ষ সাধন শিক্ষার একটা গোড়ার কথা।

মুক্ত প্রকৃতির শ্যামল অঙ্কই শিশুর মন গঠনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

...ওয়ার সজীব স্পর্শেই জ্ঞানের মুকুল তার সহজ ...গাড় করে। প্রকৃতির কোল থেকে ছিন্ন করে নিয়ে ...য় সহরের ইঁটকাঠের মধ্যে কেবলমাত্র পুঁথির মার-...কত জ্ঞাতব্য কথা শেখানয় ইন্দ্রিয়ের জড়তা দূর ... কাজেই শিক্ষা বস্তু বিচ্ছিন্ন কেতাবী শিক্ষা হয়ে ...; প্রত্যক্ষ বিশ্বের তরুলতা পশুপাখী সকলই আমাদের অপরিচিত থেকে যায়—রিয়ালিটি-র জ্ঞান জন্মেনা। ইন্দ্রিয়ের প্রবল জড়তা শেষে মনকেও আচ্ছন্ন করে, মনের কৌতূহল মরে যায়—মন তখন নিজে কোন অনুসন্ধান বা আবিষ্কারে ব্যাগ্র না হয়ে চর্ব্বিত চর্ব্বণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। চিন্তা করবার সাহস লোপ পায়; নিজের বুদ্ধি ও উদ্যমে বেড়ে উঠবো, নিজে দেখব, বুঝব, পরীক্ষা করবো এরকম একটা সজাগ সজীব বোধের সঞ্চার না হওয়ায় বড় হয়ে যখন সমাজে প্রবেশ করি তখন চারিদিক্‌কার নানা আন্দোলন ও ঘটনাকে বড় করে এবং দৃষ্ট অদৃষ্ট নানা কারণসূত্রের মধ্যে বেঁধে তাদের বিচার করতে শিখিনা, তাই কর্ত্তব্যেরও কোন পন্থা খুঁজে পাইনা। সাহিত্য পড়ি অথচ রস বোধ হয়না; বিজ্ঞান পড়ি অথচ অন্ধ সংস্কার ঘোচেনা, যুক্তি কোন বিষয়ে প্রয়োগ করতে পারি না; ইতিহাস পড়ি অথচ দেশের ভিতর-কার অতীত ও বর্ত্তমান শক্তি কত বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে দেখতে পাইনা; তুলনা করতে পারিনা, অনু-করণ করে মরি। জীবনের সকল ব্যাপারে এই যে বিষয় চিন্তহীনতা আধুনিক শিক্ষার এ এক ভয়াবহ ব্যাধি!

কেন এমনটা হোল? এর কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত'। —কারু মতে কারণটা রাজনৈতিক, কারুমতে অর্থনৈতিক; কেউ দোষ দেন অভিভাবকের, কেউ শিক্ষক-দের, কেউ বা প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির।

শিক্ষাপদ্ধতির যে গলদ তার সম্বন্ধে আগেই কিছু কিছু নির্দ্দেশ করেছি। স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেদের মন, বুদ্ধি যাতে গড়ে ওঠে, জ্ঞান এবং কর্ম্মপ্রবৃত্তি যাতে স্বচ্ছন্দ উন্মেষ লাভ করে, শরীর ও মনের সব বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মানুষ যাতে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তার জন্য চাই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কার।

শিক্ষকদের দোষ আছে সত্যি কিন্তু তার জন্য দায়ী বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের অভিভাবকগণ যেখানে শিক্ষায়তনের কাছে এইটুকু মাত্রই দাবী করেন যে ছেলের দুবেলা দুটো ভাত আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র যাতে জোটে তার জন্য একটা এমন ছাপ চাই চাকরীর বাজারে যার মূল্য আছে অথন পরীক্ষার ঝাঁপ ডিঙোবার কৌশলটুকু শেখানো ছাড়া শিক্ষকের আর কি কর্ত্তব্য হতে পারে? বিশেষতঃ পাঁচ টাকায় হোয়াইট-ওয়াস হয়না। সেই যে গল্প আছে' পাঁচ টাকার এক প্রাইভেট টিউটর ছেলেকে দুনকাষের ইংরেজী শিখিয়ে দিয়েছিলেন লাইম্ ওয়ার্ক। ছেলের বাপ শুনে বল্লেন—সে কী মাষ্টার মশায়! দুণকাষের ইংরেজী তো হোয়াইট ওয়াস। মাষ্টার মশায় অমনি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন—আজ্ঞে, তাই বটে; তবে কিনা পাঁচ টাকায় হোয়াইট ওয়াস হয়না! উন্নতির আশাহীন, স্বল্পবেতনভোগী বার্দ্ধক্যের সংস্থান বিহীন শিক্ষকগণের অবসাদগ্রস্ত মনে উদ্যম উৎসাহ আসবে কেথেকে? তারপরে তো সাত কার্ত্তার খাঁড়া অবিরত ঝুলছে তাঁদের মাথার উপর।

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রবল অসন্তোষের ঢেউ উঠেছে সে শিক্ষার আদর্শ নিয়ে নয়—তার কারণ নিছক অর্থসমস্যা। এতকাল বাঙলা দেশের পিতারা তাঁদের ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজপথে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটাচ্ছিলেন। হয় ল, নয় মেডিসিন, নয় সিভিল সার্ভিস, নিদেন পক্ষে কেরানীগিরি একটা কিছু হলেই বা হোক্ দুপয়সা ঘরে আসত, আবার অনেকের পক্ষে 'লেখাপড়া শেখে যেই, গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই' এই আশার বাণীও সফল হোত। কিন্তু আজ সব দরজাতেই বেজায় ভিড়—তাই এত হৈ চৈ। অর্থোপার্জ্জনের আর তেমন সুবিধা হচ্ছে না বলেই আজ আমরা ইংরেজী শিক্ষালয়ের প্রতি এতটা বিরূপ হয়েছি; আর জোর গলায় চীৎকার সুরু করেছি—ও সব কিছুনা, নিরর্থক হিউম্যানিটিজ আর অ্যাবস্ট্রাক্টস সাইন্সেস্-এর চর্চ্চা ছেড়ে দেও, চুলোয় যাক্

তোমার এডভান্সমেণ্ট অব লার্ণিং আর হাইয়ার কালচার। তার যায়গায় টেক্‌নিক্যাল্ স্কুলস এ্যাণ্ড কলেজেস বসাও—কেজো শিক্ষার ব্যবস্থা কর। আজকের অন্নব্রহ্মের যুগে এই সাধনাই সার সাধনা! দেশ খেয়ে বাঁচুক—পাওনাদারের তাগাদা যে আর সহ্য হয় না—মেয়ে বিয়ে দিতে মাথায় যে টাক পড়ে গেল! সব কাজের লোক গড়ে তোল—শিক্ষা হোক্ যাকে বলে একদম প্র্যাকটিক্যাল; ওসব আইডিয়ালিজিম্ ফাইডিয়ালিজিম্ শিকেয় তুলে রাখ! কিন্তু আজ উপবাসের দিনে যতই না কেন আমরা চীৎকার করি একথা ভুললে চলবেনা যে পেট যদি মস্তিষ্কের চালক হয়, তাতে পেটের কিছু লাভ হয় না—কিন্তু মস্তিষ্কের সে হয় "মহতী বিনষ্টিঃ"। দেশের উচ্চশিক্ষাকে সঙ্কীর্ণ করে' শিল্পবাণিজ্য গড়ে তোলার কল্পনা মানুষকে ইতর জন্তুতে পরিণত করবার কল্পনা। বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশ্য বিদ্যালয়ে পরিণত করবার এ প্রস্তাব আমাদের দেশে চলবেনা। যে আত্মা অমৃতের অধিকারী তাকে 'বিজ্ঞান' ও 'আনন্দ'লোকের উচ্চাসন থেকে টেনে নিয়ে এসে অন্ন-লোকে স্থাপন করলে সেটা আত্মহত্যার মতই জঘন্য পাপ হবে। অর্থ সমস্যা বা অন্ন সমস্যা শিক্ষার সমস্যা নয়। শিক্ষাকে অবশ্য অন্যান্য সকল বিষয়ের মতই আর্থিক বিষয়েও স্থান দিতে হবে; কিন্তু শিক্ষার আলয় অন্ন-সমস্যার সমাধান ক্ষেত্র কখনই হতে পারে না। হাতে কলমে শিল্প শিক্ষার যথার্থ স্থান হচ্ছে কারখানা, আর তার বৈজ্ঞানিক অংশ শিক্ষার যথার্থ স্থান হচ্ছে ঐ কলেজ অব অ্যাপ্লায়েড্ সায়েন্সেস্। শিক্ষাই মানুষ গড়ে—আর অর্থনীতিই বলুন বা অন্যসূত্রই বলুন গড়ে তোলে সেই মানুষ। আনন্দের সৃষ্টির পেছনে যেমন, প্রয়োজনের সৃষ্টির পেছনেও চাই ঐ মানুষ। আর ঐ মানুষ গড়বার মন্ত্রই হচ্ছে শিক্ষা! আত্মোন্নতির প্রচেষ্টাই যে আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় এর প্রমাণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেই মিলবে। তা ছাড়া, আমাদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ রয়েছে রাজনৈতিক সমস্যার ভেতরে। এবং যেহেতু শিক্ষার আদর্শকে বাস্তব করতে গেলে প্রধান না হোক প্রথম প্রয়োজন অর্থস্বচ্ছলতা সেহেতু শিক্ষার রাজনৈতিক সমস্যা আমাদের পক্ষে গুরুতর হয়ে উঠেছে।

এমনিভাবে খুঁটিনাটি বিচারে প্রবৃত্ত হলে বড় সমস্যাই চোখের সামনে জেগে ওঠে। এ জায়গার মধ্যে সে সব কথা উঠিয়ে আপনাদের কষ্ট করতে চাই না।

এইবার শিক্ষার যে বিশ্ব সমস্যা—যে সম্পূর্ণতার আদর্শ আধুনিক চিন্তারাজ্যে বিপ্লবের সূচনা করেছে তার উল্লেখ করেই এ প্রবন্ধ শেষ করব।

বৈজ্ঞানিক জড়বাদী য়ুরোপ এতকাল প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধার খাতিরে কেজো শিক্ষা-লাভই শিক্ষার চরম আদর্শ বলে মনে করেছিল। কিন্তু আজ এ্যাটম ও ইলেকট্রন-এর পরমাশ্চর্য্য তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হওয়ায় জড়বাদ গুরুতররূপে আঘাত পেয়েছে। প্রকৃতির রহস্যের মূলে গিয়ে তাই মানুষ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এই 'হঠাৎ আলোকের চম্‌কানি লেগে' আজ পশ্চিমের 'চিত্ত' 'ঝল্‌মল্' করে উঠেছে! সকল শক্তির মধ্যে একশক্তি, সকল উপাদানের মূলে এক উপাদান, সকল বিচিত্র নিয়মের ভিতরে একটি সকল নিয়ম এই রহস্যময় ঐক্যবোধ—এই আধ্যাত্মিকতার আভাস আজ মানুষকে চমকিত করেছে। মানুষ আজ তার স্বার্থগণ্ডীর বাইরে একটি বৃহত্তর জীবনের স্বাদ পেয়েছে। সে আপনাকেও নিঃশেষে জানেনি, সমগ্র-কেও নিঃশেষে জানতে পারেনি বিশ্বজীবনের এই আশ্চর্য্য রহস্যোপলব্ধি আজ শিক্ষা সম্বন্ধে তার ধারণা বদলে দিয়েছে। মানুষ সম্বন্ধে, বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে এই 'আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি'-ভাব যাতে বাল্যকাল থেকেই ছাত্রের সমস্ত জীবনের মধ্য দিয়েই সংস্কারের মত বেড়ে ওঠে বর্ত্তমানে শিক্ষার জন্য এমনিতর আয়োজন দরকার হয়ে পড়েছে।

আজ মানুষ শুধু জানতেই চায় না—সে হতেও চায়। জ্ঞানের সঙ্গে হৃদয় মন চরিত্রের শতদল বিকাশ সাধনের জন্য আমাদের সেই প্রাচীন তপোবনের আদর্শই যেন নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি কল্পনা দানা বেঁধে উঠ্‌ছে।

পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও তাই আজ যেন বলতে শুনছি

স্তাং তেনাহং কিম কুর্য্যাম্"! এ যুগের ...শিও বলতে সুরু করেছেন—'সা বিদ্যা যা ব্রহ্ম ময়!

...আমেরিকান্ এডুকেশানিষ্ট এর মুখেও আজ ... । শুনতে পাচ্ছি—"When a sense of the ...finite reach of an act physically occurring in a small point of space and occupying a petty instant of time, comes home to us, the meaning of a present act is seen to be vast, immeasurable, unthinkable!"

ইংরেজের 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' মনেও আজ ধাক্কা লেগেছে। তাই একজন আধুনিক 'ইংলিশ এডুকেশানিষ্ট' এর কলমে এমন অদ্ভুত কথা বেরোলো—"The aim of all schooling in all its pursuits is to help our pupils to see themselves and their neighbours in the light of the universal!"

এমনি একটা বড়-রকমের বোধ জীবনের মধ্যে সঞ্চার করে দিয়ে শিক্ষার এই দৈন্য দূর করবার জন্য চারিদিকে আজ বোধনের শঙ্খ বেজে উঠেছে। ভারতের সেই মহা-গৌরবময় অতীত যুগে যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার বুঝি বা খোলে! সেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে চির-রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে ঋষির কণ্ঠে প্রথম প্রভাতের যে জ্যোতির্ব্বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'....., হে পশ্চিম, তুমিও কি আজ সেই বাণীর দেখা পেয়েছ—তুমিও কি জেনেছ সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে—সেই মহৎ সত্যকে,—নিশারসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জানে! তাই তোমার কণ্ঠেও আজ সেই অমৃতমন্ত্রের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি—"যস্ত সর্ব্বাণিভূতানি আত্মন্যে বানুপশ্যতি, সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং".....

আধুনিক শিক্ষায় এই বিশ্বরূপদর্শনের উপযোগী আলোকের সঞ্চার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে আজ অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে।

তুলসী তলার প্রদীপটি

—শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী।

নদীর ধারে মাঠের এক প্রান্তে ছোট একখানি কুটীর; বেঁধেছে একজন উদ্বাস্তু। খড়ে ছাওয়া কুটীর। পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনা বেড়া দিয়ে ঘেরা। একধারে একটি কুয়ো আর একধারে মাটির বেদির উপর একটি তুলসী গাছ। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তার তলায় মিট্ মিট্ করে জ্বলছে ছোট্ট প্রদীপটি। চারদিকের অন্ধকারের মাঝে আলোর একটি স্নিগ্ধ পবিত্র প্রকাশ।

তুলসী তলার প্রদীপটী গৃহস্থের হৃদয়ের সব কথা-গুলিই যেন বলে দিয়েছে। পৈতৃক বাড়ী ছিল তার পূর্ব্ব-বঙ্গে। গাছ-গাছড়ার প্রাঙ্গণে পুকুরে সুন্দর বাড়ী। আর ছিল হিন্দু মুসলমানে ভরা প্রিয় প্রতিবেশীর দল। কত কাল ধরে এক সঙ্গে বাস করে এসেছে। কোন্

পুরুষের প্রথম পরিচয় দিনের পর দিন প্রীতির রসে পুষ্ট হয়ে আত্মীয়তার বন্ধন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ এক দিন এল ঝড়। ভেঙ্গে গেল এতকালের ঘরদোর! টুটে গেল এত দিনের বন্ধন! বিদ্বেষের যে দানবটা মাথার একটি নাড়াতে উপর তলার স্নেহপ্রীতি বিশ্বাসের গোটা ছাদটাকে চুরমার করে ফেলে দিলে এতদিন সে কোথায় লুকিয়ে ছিল? গৃহস্থের সামনে এল কঠিন প্রশ্ন। দেশ ছাড়ব না ধর্ম্ম ছাড়ব। সমাধান তা সহজ নয়। দেশ! যে মাটির স্পর্শ দেহে তার প্রথম রোমাঞ্চ জেগেছে, প্রথম চোখ খুলেই সেখানকার আকাশ যে দেখেছে, সেখানকার মধুর বাতাস সে প্রাণ ভরে নিয়েছে সেই দেশ। জননী জন্মভূমি। একদিন তার পিতা ছিলেন, মাতা ছিলেন। ছিলেন পিতামহ। আজ তাঁরা কোথায়? কোন মাটি। তাদের সেই প্রাণারাম স্মৃতি জাগিয়ে দেয়, সে যে এই মাটি। এই মাটি তার মনে রস জোগায়, মুখে জোগায় ভাষা। কেমন করে ছাড়বে সে এমন মাটিকে। কিন্তু ধর্ম্ম! সে ও যে তাঁর সমস্ত সত্তাকে জড়িয়ে রয়েছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, অতীতে কি ভবিষ্যতে, তাকে বাদ দিয়ে ত ভাবা যায় না। কবে কোন্ যুগে কে জানে, ইতিহাসের অব্দের মাপকাঠিতে তার আয়তন ধরা পড়ে না, ভারতের কোন্ পুণ্য নদীর তীরে তপোবন তলে 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' বলে আহুতি দিয়ে ঋষি যে অগ্নিশিখাটি উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন তার প্রাণময় উত্তাপটি আজও সে অন্তরের গভীরে অনুভব করে। একদিন কোন এক আনন্দ উজ্জ্বল প্রভাতে উদাত্ত কণ্ঠে ঋষি ঘোষণা করেছিলেন, "শোনো বিশ্বজন,

শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ পুরুষ যিনি আঁধারের পারে।
জ্যোতির্ম্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি"
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।

সে কথা ও সে ভুলতে পারে না। আজও সে কথাটি ভেবে তার চিত্ত তরঙ্গিত হয়ে ওঠে।

এই ভারতেরই বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। এই পবিত্র ভূ. ভগবান বুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন—"মাতা দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন এইরূ প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে।" তাঁর কৃ স্পর্শে ভারতের চিত্তশতদল শতদলে বিকশিত হয়ে উঠেছি সৌরভে তার আমোদিত হয়েছিল সর্ব্বদিক। তারপর কত না মহাপুরুষ শংকর, রামানুজ, চৈতন্য, নানক, কবীর, তুলসীদাস আরও কতজন। কত না দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি। আজ তার জীবনের যে রূপটী দেখা যায় তাতে আছে এ সকল মহাপুরুষের আর এসব গ্রন্থের অপরিমেয় দান। শুধু তার নয় যে সমাজের সে অংশ সে সমাজই যে এই উৎস থেকে প্রাণ-রস সংগ্রহ করে। তার পূজা-পার্ব্বণ আচার নিয়ম ব্রত সমস্তই এই মহাপুরুষদের সাধনার ধারা-বহন করে চলেছে। আজ সেই ধারা বিপন্ন। কিন্তু এ ত তার ধর্ম্মের একটি দিক মাত্র। অপর দিকটির কথা ভেবে ও সে অস্থির হয়ে উঠল। হিন্দুর ধর্ম্ম, সংস্কৃতি মূলক ধর্ম্ম। যুগের পর যুগ নব নব রূপে তার বিকাশ। কাব্যে, দর্শনে, সাহিত্যে, জ্যোতিষে তার নব নব রূপায়ণ। সেই রামায়ণ, মহাভারত, মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব্ব প্রতিভার অবদান—কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত, শকুন্তলা প্রভৃতি মাঘ ভারবি, ভবভূতি, বাণভট্ট, শ্রীহর্ষের মনীষার নিদর্শন রাজী, বাদরায়ণ, গৌতম, কপিল, কণাদ, জৈমিনি, পতঞ্জলির দার্শনিক তত্ত্বাবলী, আর্যভট্ট, বরাহ-মিহির, ভাস্করাচার্য্যের অমূল্য উপহার সমৃদ্ধ কালে কালে তার সমাজ চিত্তকে সরস করেছে—সফল করেছে। আরও কত না মণীষী সে সাধনায় প্রাণ মন সমর্পণ করেছিলেন।

তারপর পুরাণ যুগের অবসানে মহাত্মা রাজা রাম মোহনের সাধনায় যে প্রভাতের আবির্ভাব হল সে মঙ্গল প্রভাতে একে একে এলেন ভারমাতার পূজারীবৃন্দ এলেন কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, এলেন মধুসূদন, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, এলেন দিগন্ত উদ্ভাসিত করে রবীন্দ্রনাথ,

মৃতস্থ

বিপিনচন্দ্র, ভারতের প্রাণ সাধনায় যোগ দিলেন বঙ্গে। মায়ের মুক্তি সাধনার ব্রত নিয়ে এলেন তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, সুভাষ, জহর আরও কত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সন্তান দল। তাঁদের সকলের একটি মাত্র কথা ভারতবর্ষ আমাদের প্রিয় প্রিয়তম। "ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" এক দিন ঋষির উদাত্ত কণ্ঠে যে ধর্ম্মের যে সমাজের যে দেশের অন্তরতম ভাবটি ভাষা পেয়েছিল সে ধর্ম্ম আর সমাজ আজ কালের দীর্ঘ পথ অতিবাহন করে এই রূপ লাভ করেছে। সে যে এই সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতবর্ষের পুণ্যনাম তার সমগ্র সত্তাকেই যে জড়িয়ে আছে। সে নামের মায়া সে কেমন করে ছাড়বে। কিন্তু না ছাড়লে যে থাকা চলবে না। পূর্ব্ববঙ্গে সে নাম নেওয়া চলত কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তানে যে সে নামের উচ্চারণ রাষ্ট্রবিদ্বেষ সূচক। 'বন্দেমাতরম্' যে সেখানকার কাণে অসহনীয়। তাই তার পথ বেছে নিতে হল। হৃদয়ের মণি কোঠার প্রাণের প্রদীপশিখাটি লুকিয়ে মৃতমাতৃ দেহের মতই প্রিয় জন্মভূমিকে ছেড়ে চোখ মুছতে মুছতে বেড়িয়ে পড়তে হল সে দেশের উদ্দেশে যেখানে তার প্রদীপ শিখাকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে, যেখানে থাকবে তার আলোক ধারা অনির্ব্বাণ।

সেই শুধু এমনি করে পথ বেছে নেয়নি, নিয়েছে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ জন। নিজেদের মূল সত্তাকে ঘিরে যে স্বাতন্ত্র্য, যে মর্য্যাদা, যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট গড়ে উঠেছে তাকে বিসর্জ্জন দিতে না পেরে দেশে দেশে কালে কালে কত না মনীষী কতনা সাধক সজ্জন প্রিয় জন্মভূমিকে জন্মের মত ছেড়ে চলে গেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আর্য্য বা দ্রাবিড় দের কথা ছেড়ে দিলে ও ঐতিহাসিক যুগেও উদাহরণের অভাব ঘটবে না। মুসলমান আক্রমণে একদিন গ্রীসের মনীষীবর্গ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ওদন্তপুরের বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পর মুসলমানের অত্যাচার আশংকা করে অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক এমনি করেই তিব্বতের বুকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সেদিনও হিটলারী বর্ব্বরতার প্রকোপে মহামনীষী আইনষ্টাইনকে আশ্রয় নিতে হল আমেরিকায়।

আবার সে আজ আসন পেতেছে। স্থাপন করেছে প্রদীপটি তুলসীমূলে। তার অন্তর প্রদীপ ভারতমাতার চরণতল আলোকিত করে শোভা পাচ্ছে। আশা জেগেছে মনে। আর একবার নতুন করে যাত্রা সুরু করবে এই প্রদীপেরই আলোকে। দীর্ঘ রাত্রির তমসা কেটে দিয়ে ভরে উঠবে তার জীবন ফুলে ফসলে। প্রাণের পুলকে সে গাইবে বন্দেমাতরম।

তারক আভরণ ষ্টোর্স
নিউ মার্কেট, বালুরঘাট।।
এখানে লোহার যাবতীয় মাল পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।
প্রোঃ—বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার ও সুরোজিত কর্ম্মকার

অলঙ্কারের বৈশিষ্ট ও সময়ের নির্ভুলতার জন্য!
কাঞ্চনাগার
মেন রোড বাজার, বালুরঘাট।
পোঃ—ব্রজেন্দনাথ কর্ম্মকার
(মন্টু বাবু)

শেষ শিকার

শ্রীদেবব্রত বাগচী।

আমাদের পাড়ায় ছোট দাদুকে সবাই চেনে। ভদ্রলোক পাকিস্তানের জমিদার ছিলেন। পাকিস্তানে সমস্ত সম্পত্তি পড়ায় তিনি নিঃসহায় অবস্থায় আমাদের প্রতিবেশী। সেইজন্য আমাদের ওঁকে আপন করে নিতে বেশী দেরী হয় নি। ভদ্রলোকের যে কি নাম তা আমরা কেউই জানি না। তিনি আমাদের সকলের 'ছোড়দাদু'।

একটা ঘরে একজন চাকর নিয়ে ভদ্রলোক বাস করেন। শোনাবার ফুলবাড়ী যে এঁদের সম্পত্তি আছে, সেখান থেকে লোক মারফৎ ইনি টাকা আনিয়ে নেন। এতেই এঁর দিন চলে যায়।

ছোটদাদু এক কালে ভাল শিকারী ছিলেন। তার বহু নিদর্শন আজও তাঁর ঘরে পাওয়া যায়। বাঘের চামড়ার আসন, হাতির দাঁতের মোড়া ইত্যাদি ওঁর ঘরটাকে শোভা বর্দ্ধন করে। ছোটবেলা থেকেই আমার শিকার কাহিনী পড়বার খুব সখ। তাই আমি ছোটদাদুকে খুব ভালবাসতাম। ছোটদাদুর আবার খুব গল্পের বই পড়ার বাতিক ছিল। আমি তাঁকে তাই আমার চেনা জানা লোকের কাছ থেকে বই জোগাড় করে পড়াতাম। ফলে তিনি খুশী হয়ে আমাকে শিকারের গল্প বলতেন। কত রকমের গল্প। কত তাদের বৈচিত্র। কত অভিজ্ঞতা প্রসূত রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী। বেশ মনে আছে একবার বলেছিলেন যে গফুর মিঞা নামে তাঁদের এক মুসলমান প্রজা কি রকম মাটিতে হাত দিয়ে বলে দিতে পারত বাঘের অস্তিত্ব। অবাক হয়ে ভাবলাম এও কি কখনও হয়।

বিশ্বাস করতাম না। তাই অবিশ্বাসের সুরে বলতাম, "এও কি কখনও হয় ছোড়দাদু, এযে অবিশ্বাস্য।

সহাস্যে ছোটদাদু বলতেন, চেন না এই সব সুন্দর বনের মুসলমান চাষীদের। আমিও ছাই বিশ্বাস করেছিলাম ও ব্যাটার কথা। আচ্ছা তবে হল কি শোন। আমাদের সেদিন জমিদারী ছাড়িয়ে সুন্দরবনের গভীর অংশে শিকার করতে যাবার কথা। ঠিক হল আমরা সবাই নৌকা চড়ে যাব। সব শুদ্ধ আমরা ছয়-সাত জন। যে দিন যাবার কথা ছিল, সেই দিনই নৌকাটা গেল ফুটা হয়ে। ফলে যাত্রা পিছাতে হল। কি করি! আমি আর নায়েব হরিচরণ বাবু রওনা হলাম নৌকাটার অবস্থা দেখতে—পর দিন যাওয়া যায় কি না? নৌকার অবস্থা দেখে নায়েব মশাই বললেন, 'চলেন হুজুর একটু ঘুরে যাই, আপনার হাতে ত টোটাভরা বন্দুক আছেই। নায়েব মশাই একা খুব ভীতু। তবে আমি থাকলে তার খুব সাহস। এমনসময় গফুর কোথাথেকে এসে আমাদের সাথে জুটে গেলে। আমরা রওনা হলাম। হঠাৎ এক যায়গায় থেমে মাটিতে হাত দিয়েই গফুর বলল, "যে সামনে বাঘ আছে। আমাদের আর আগাতে নিষেধও করে দিল। আমার একটু রাগই হল।

ত দিয়েই বাঘের অস্তিত্ব টের পায়। তাই
পদক্ষেপ করেই সম্মুখে রওনা হলাম। তখন
ছে। সূর্য অস্ত গেছে। হঠাৎ দেখি
হরিণ আমাদের দু'পাশ দিয়ে তীব্রবেগে পালিয়ে
গ। সঙ্গে সঙ্গে আমার শীকারী মন চঞ্চল হয়ে
উঠল। আবছা অন্ধকারে মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরেই
দেখতে পেলাম এক বাঘ। অতবড় বাঘ আমি আর
জীবনে দেখিনি। আমার মনে হয় লেজ সমেত
বাঘটা সতেরো আঠারো হাতের কম হবে না।
আমাদের সাড়া পেয়েই হোক, আর যে কারণেই হোক
বাঘটাকে আর দেখা গেল না। সুন্দরবনের চাষীরা
প্রত্যেকেই এই রকম অভিজ্ঞ।"

এই রকম প্রায় প্রত্যহই একটা না একটা শীকারের গল্প আমরা শুনতাম। দাদুও ফেলে আসা জীবনের কথা বলে খুব তৃপ্তি পেতেন। তা ছাড়া তিনি বলতেও পারতেন খুব রস দিয়ে। কোন দিন বলতেন কুমীর শীকারের কথা, কোনদিন বাঘ কোনদিন হাতি, আবার কোনদিন ভ গণ্ডার শীকারের কাহিনীও বলতেন।

এমনি অনেক দিনই অনেক রকম শীকারের গল্পই আমি ছোটদাদুর মুখে শুনে এসেছি। কিন্তু হরিণ শীকারের গল্প একবারও বলেন নি দাদু। তাই একদিন ঔৎসুক্য জাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদু আপনি কোনদিন হরিণ শীকার করেন নি?"

দাদু অল্পক্ষণ চুপ করে থাকলেন, পরে আস্তে আস্তে বললেন, করেছি একবার। সেই আমার শেষ শীকার। তারপর আমি আর শীকার করি নি। বন্দুকও আমি আর ধরিনি। রেখে দিয়েছিলাম কয়েক বৎসর ফুলবাড়ীতে। তারপর পাকিস্থান হলে থানায় জমা দিয়ে এসেছি। শীকারী আমি। অত অল্পেতে আমার বুক কাঁপে না। কিন্তু সেদিন যা দেখেছি..." দাদু চুপ করে যান।

"বলেন না দাদু, হরিণ শীকারের ঐ গল্পটা। আপনার মুখে অনেক দিন অনেক রকমই গল্প শুনে আসছি, কিন্তু হরিণ শীকারের গল্প একবারও শুনিনি।" মিনতি করলাম আমি।

ছোটদাদু বলে চলেন, "আমি আজকে বলছি, এরপর আমি আর এ গল্প কাউকে বলতে পারব না। এখনও এ কথা চিন্তা করলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

জান তো সুন্দরবন এলাকায় আমাদের কিছু সম্পত্তি ছিল। এখন অবশ্য সবই পাকিস্থান এলাকায়। প্রতি বৎসর শীতকালে আমি শীকার করবার জন্য একবার করে মাস দুয়েকের জন্য সুন্দরবনে যেতাম। সেবারও পৌষ মাসের শেষাশেষি একদিন গিয়ে উপস্থিত হলাম জমিদারী সেরেস্তায়। সঙ্গে আমার কিছুই ছিল না, কেবল আমার প্রিয় বন্দুকটা।

নায়েব হরিচরণবাবু জানতেন কেন আমি ওখানে গেছি! কারণ প্রতি বৎসর ঠিক এই সময়েই আমি শীকার করতে যাই। এছাড়া ভদ্রলোক নিজেও একটু আধটু শীকার করতেন। তবে ভদ্রলোকের মজা ছিল এই যে তিনি একটু বেশী রকমের ভীতু ছিলেন। তাই আমার অনুপস্থিতিতে ওনার বিশেষ সুবিধা হত না। আমিও দেরী না করে পরের দিনই ওনাকে ডাক দিয়ে পাঠালাম। রাজস্ব সংক্রান্ত এবং অন্যান্য জমিদারী বিষয় খবরাখবর নেবার পর তাঁকে শিকারের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

উনি গদগদস্বরে জানালেন, "হুজুর এবার একটা সুখবর আছে। একপাল হরিণের জল খাওয়ার এক আস্তানা আবিষ্কার করেছি। অন্যান্যবার তো বাঘ, কুমীর ইত্যাদি শিকার করেন, এবার একবার হরিণটাই না হয় শিকার করে দেখুন। পরে ধীরেসুস্থে বাঘের খোঁজ করা যাবে।

হরিণ শিকার করাটা সব চাইতে কঠিন। অদ্ভুত চেতনা সম্পন্ন জীব এই হরিণ। সামান্য একটু শব্দে এরা পালিয়ে যায়। আর এরা এত বেগে ছুটতে পারে যে বাঘও এদের সহজে ধরতে পারে না। বাঘ যদি হরিণকে তাড়া করে তবে সহজে তাকে ধরতে পারা বাঘেরও অসাধ্য। তাই

ার লাফার একুশ হাত আর হরিণ লাফায় বাইশ হাত। নিতান্ত দুর্ভাগা না থাকলে এবং পাকা শিকারের হাত না থাকলে হরিণ শিকার করা অত্যন্ত কঠিন। নিজের মল-ত্যাগ করে, শুকনো পাতার উপর তার শব্দেই পালিয়ে যায় হরিণ। রাতে যখন ঘুমায় তখন গোল করে সব দিকে মুখ রেখে একদল হরিণ ঘুমায় এবং একজন পালালেই সব এক-সাথে পালায়। তবে হরিণ শিকার করবার একমাত্র সুবিধা হচ্ছে জল খাওয়ার জায়গাটা আবিষ্কার করা। সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা গোপন জায়গা থেকে দলে দলে বার হয়। আবার রাত শেষ হবার আগেই আস্তানায় ফিরে আসে। এর মধ্যে যে খাবার পায় তাতেই ওদের চলে যায়। তবে পিপাসা লাগলে পাগল হয়ে ওরা দল বেঁধে জল খেতে ছুটে আসে। এইসব কারণে বহুদিন থেকেই আমার হরিণ শিকার করবার একটা স্পৃহা ছিল। তাই নায়েবের কথায় সহজেই রাজী হয়ে গেলাম। তাঁকে সব বন্দোবস্ত করতে বলে দিলাম।

নায়েব মশাইয়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী পরের দিন আমরা হরিণ শিকার করতে সেই জলাশয়ের দিকে রওনা হলাম। তখন রাত আড়াইটা। পূর্ণিমা রাত। আমার ইচ্ছা ছিল অন্ধকার রাতে শিকার করব, কিন্তু নায়েব মশায় জানালেন যে পূর্ণিমা রাতে হরিণরা মাতাল হয়ে যায়। তাই ওদের সেদিন হুঁস সবচাইতে কম থাকে। নির্দিষ্ট জায়গায় যেয়ে নায়েব মশাইয়ের কথামত ঝিল থেকে বিশ হাত দূরে একটা ঝোপের আড়ালে আমরা লুকিয়ে রইলাম। অবশ্য তার আগেই ঝোপটা বেশ ভাল করে দেখে পরিষ্কার করে নেওয়া হল।

পূর্ণিমা রাত। সারা সবুজ বনানীর উপর জোৎস্না ভরা আলোয় ঝলমল। অপূর্ব এক শিহরণ জাগিয়ে তুলল মনে। শীতকালের শেষ রাত্রি। চারিদিকে কুয়াশা ঢাকা। ঝাপছা সবুজের উপর পূর্ণিমার মায়া ভরা আলো। ঝিলটাকে মনে হচ্ছিল স্বর্গের মন্দাকিনী। মনে হচ্ছিল এখুনি হয়ত অপ্সরারা তাদের অপরূপ রূপের ডালি নিয়ে নেমে আসবে। জলকেলি করতে। বর্ণনা করবার মত ক্ষমতা আ। শেষরাতের জমাট অন্ধকার। মনে হচ্ছিল কলকো জীবন থেকে আমরা চলে এসেছি কতদূরে, হ নূতনতর জগতে। শিকারী আমি। আমার লক্ষ্য আজ পর্য্যন্ত শিকার আমার হাত থেকে কোনদিনই ফ যায়নি। নিজের উপর আমার অদ্ভুত বিশ্বাস। আত্ম-বিশ্বাসই শিকারীদের মূল। সেদিকে আমি পূর্ণ অবহার নির্ভরশীল পাটাতন। একটা বাঘ শিকার করে আমি আনন্দ পেয়েছি, আর কিছুতেই এ পৃথিবীতে আমি অত আনন্দ পাইনি। চাঁদের আলোতে আমি কোন দিন কোন নূতনত্ব খুঁজে পাইনি। চাঁদের আলো আমার কাছে চাঁদের আলো ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু আজ যেন কেমন নূতন সুর খুঁজে পেলাম আমি।

হঠাৎ নায়েব মশাই অত্যন্ত ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, "এসেছে হুজুর।" এই স্বরটা আমার হঠাৎ ভৌতিক স্বর বলে বোধ হল। চুপ করে রইলাম। এক দুই করে হরিণের দল ভীড় করতে লাগল। কি অপরূপই না দেখতে লাগছে ঐ হরিণগুলোকে। সুন্দর হলুদ ওদের গায়ের রং মধ্যে মধ্যে ডোরা কাটা। বেঁকা বেঁকা শিংগুলোর মধ্যে কি অপরূপ মাধুর্য্য। পিট পিট করে চাইছে। পা অবধি জলে নামিয়ে দলে দলে জলপান করছে। জলের মধ্যে অপূর্ব লহরী উঠছে। ছোট ছোট ঢেউ বড় হয়ে আস্তে আস্তে সারা ঝিলে ছড়িয়ে পড়ছে।

নায়েব মশাই আমাকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিলেন। চমকে উঠলাম। দেখলাম আমাদের মাত্র পঁচিশ হাত দূরে চারটে হরিণ। একটা মর্দ্দা, একটা মাদী আর দু'টো ছোট ছোট শাবক। একেবারেই ছোট। যেন একটা হরিণ পরিবার এসেছে আজকের স্বর্গের পরিবেশে অতিথি হয়ে। শিকারী-মন বুঝল এই সুযোগ। এরপর আর এমন মুহূর্ত্ত আসবে না। গর্জ্জে উঠলো আমার দোনালা বন্দুক। আর বড় বনানীর জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল। চারিদিক কেঁপে উঠলো। তারপর কতকগুলো বিদ্যুৎ খেলে

CENTRAL LIBRARY

শারদীয়া আলেখ্য

গেল। এক ঝলকে পালিয়ে গেল মিলের

গুলি ব্যর্থ হবার নয়। মর্দা হরিণটা মাটিতে

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল নায়েব মশাই

নিজে। কতদিন ওরে ওরা সুন্দরবনে আছে,

কিন্তু এক শর্তে কোনদিন হরিণ পরতে দেখেনি ওরা।

সাধারণতঃ হরিণ গুলি খেয়ে পালায়। তারপর ছয় সাত

মাইল ঘুরে ফিরে মারা যায়। এই হরিণ আহত হয়ে যাতে

চোখের আড়ালে চলে যেতে না পারে সেইজন্য নায়েব মশাই

গরুরকে এনেছিলেন।

কিন্তু এ কি? মর্দা হরিণটা মরে পড়ে আছে, তবুও

মাদী হরিণ আর বাচ্চা দুটো এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

বাচ্চা দুটো মর্দা হরিণটার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে

আছে। আর মাদী হরিণটা চুপ করে জলভরা করুণ চোখে

চেয়ে আছে মর্দা হরিণটার দিকে। এ আমি কোন দিন

দেখিনি। গুলির সম্মুখে ঐ রকম ভাবে কোন হরিণকে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি। কি অদ্ভুত চোখের ভাষা ঐ

মাদী হরিণটার।

নায়েব মশাই আবার গুলি করবার জন্য আমাকে

ইঙ্গিত করলেন। সুযোগ ছাড়বার লোক উনি নন। আমি

কি তখন তা শুনতে পেলাম। এই জোৎস্না প্লাবিত নিস্তব্ধ

রাতের এই স্বর্গীয় পরিবেশে আমাকে আজ পাষণ্ড বলে মনে

হল। আমি খুনী! কি মায়া ঐ মাদী হরিণটার। জানে

এখনই যদি না পালায় তবে হয়ত প্রাণ দিতে হবে স্বামীর

হাতে। তা যাক। কি হবে আর বেঁচে, যদি স্বামীই না

বাঁচলো। হরিণটাকে দেখে মনে হল আজ সে জিব দিয়ে

চেটে তুলবে তার স্বামীকে। কি অপূর্ব পতিভক্তি! কেমন

যেন হয়ে গেলাম আমি। ভগবানের এক অপূর্ব সৃষ্টিকে

সরিয়ে দিলাম পৃথিবী থেকে। অত সুন্দর চাঁদের আলো।

কিন্তু তবুও মনে হল নিস্তব্ধ বনানী যেন হা হুতাশ করছে।

মনে পড়ে গেল আমি যেন সেই ব্যাধ যে জহ্নবী নদীর তীরে

সুখে প্রেমরতা ক্রৌঞ্চকে তার প্রেমিকার সম্মুখ থেকে

প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছিল। আজ সেই মৃত স্নেহের চারপাশে

আজকের এই মাদী হরিণটার মত সেদিন ক্রৌঞ্চী কত না

কাতর আর্তনাদ করেছিল। হটাৎ বন্দুকটা তুলে নিয়ে

নিজেকে অবশিষ্ট গুলিটা দিয়ে শেষ করে দেবার প্রবৃত্তি

জাগল। হয়ত তাই করতাম, কিন্তু তার আগেই নায়েব

মশাই বন্দুকটা কেড়ে নিয়েছিলেন। এরপর আর কিছু

মনে নেই, শুধু মনে আছে, আমার অপরাহ্ণের ক্ষুধা নেই।

স্মরণ-স্বাদ

শ্রীকিরণচন্দ্র দে-সরকার

এখনো গোধূলিতে মুকুতার আখিজল পেয়েছি—

কারার প্রোকবিনী-সুরায়

এখানে সন্ধ্যার অবকাশে আমার নির্জন চোখে মৌন-চিহ্নলেখা

ধূসর গভীর অন্যমনস্কতার স্মৃতি-দীপ জ্বালি মিটি-মিটি—

হৃদয়ের সুগোপন গভীরে।

অনুভূতির তন্দ্রালু রজনীগন্ধার সুষমায়
—নরম আঁধার রাত্রির বেদনা !
স্বপ্নালিকা, তোমাকে পেয়েছি কোনায় কোনে !
—শীতালু চাঁদের নরম আলোয় চিন্তার দীপে ;
—জেগে ওঠা চাপেলী-ছায়ায় !
কবি-মনে ছুঁয়ে আছে প্রেম ;
শিশির-বেদনা তোমার স্মৃতির ভাড়া ছাড়া নীর—
চোখের ঝরণা পথে চাঁদের বেদনায় গ'লে হয় মুকুতার নদী।
স্মরণিকা, তোমাকেই বারে বারে খুঁজি—
তারা-ভরা আকাশের নির্জ্জন স্মরণ-বাদে।

তিস্তা বাঁধে কিছুক্ষণ

—মুস্তাফির নবী

এখানে আকাশ সজল মেঘেতে ঢাকা
মনের আকাশে ওড়ে তোমার কথার পাখীরা—
ভেসে আসে বালিশ ঘাটের নৌকো,
এইখানে এই তো তিস্তা বাঁধের ধারে,
—একটা ছোট্ট কড়িং এর মতো ;
দু' একটা কথা দিয়ে কাটছিলো সময়
ছেঁড়া কাটা কথা, ভাংগা ভাংগা মন
তিস্তার স্রোতের মতন—
তোমার-আমার মনে ঘুরছে তখনো কল্পনা-লাটিম।

এমন সময় ওরা এলো—একটা 'পেয়ার' (pair)
চলে গেলো ব্রীজ পেরিয়ে করলা ওপারে বেঁটে ছেলেটি ছেলেটির মুখে জলন্ত চুরুট—

সাড়ে সাত বেজে যায় ঘড়ির কাঁটায়
যায় যাক্ তাতে আমাদের কিবা এসে যায়
কার যেন স্মৃতি জাগে এক লহমায় ;
দূরে জ্বলে আলো বার্ণিশ ঘাটের,
একটি দু'টি আলো—স্ফটিকের মতো জ্বলে
মিটি মিটি আলোগুলো কী কথা যে ব'লে
ভাষা বোঝা দায়—
নরম মমতাটুকু গলে গি'য়ে নদী হোতে চায়।
পাথরের ওপর ব'সে ব'সে শুনি গান,
শুনগুনিয়ে হয়তো কখনো ভেঁজে চলি নিজেও কিছুটা—
"কত কথা জাগে মনে পারিনা যে ভুলিতে"
কথা বলি পুরানো বন্ধুটির সাথে ওগো মোর সলিতে
শুধাই কুশল কিম্বা কর্মস্থল চল্‌ছে ক্যামন ইত্যাদি ;
চুটি-খৈনী মুখে ফিরে চলে বাঁধের শ্রমিক,
দেহাতি কুলিনীর মুখে বিড়ি, চোখে মুখে অবাক বিস্ময় ;
আমারো মনের পৃথিবী নির্বাক হোয়ে যায়
তারপরে ভাংগামনে ফিরে আসি নিজের আস্তানায়।

শেষ দিনে

—কমলা ভট্টাচার্য্য

শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ
বঙ্গভূমে অবতীর্ণ
শতাব্দী হইতে পূর্ণ;
এই যজ্ঞ রঙ্গ ভূমে।
কালের বিচিত্র গতি,
কিছু নাহি হয় স্থিতি,
হয় তাও লুপ্ত স্মৃতি,
নিষ্ঠ মনোগ্রামে ॥
পূর্ণ ব্রহ্ম অবতরি,
ভব রোগে পরিহরি,
বাহু বিস্তারিয়া লেয়,
শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ে।
দেহ-জ্ঞান পাশরিলা,
সুপ্ত শক্তি জাগাইয়া,
মহাজ্ঞান প্রদানিয়া,
রাখে স্নেহচ্ছায়ে ॥
স্বপ্নমাখা জীবনের
করে সার্থকতা,
তুলিয়া লইয়া কোলে
করে পদাশ্রিতা ॥
হে জীবেশ কর এই
মম জীবাধমে,
তব পদ রজ ধ্যানে,
বহাইয়া পরিণামে;
সুন্দর স্বভাবান্বিত
তুষ্ট স্নেহে প্রেমে।
তোমার মহিমান্বিত,
অঙ্কণিত রাশী।
কত শত কীর্ত্তিগাথা,
মুক্ত অবিনাশী।
করিয়া হৃদয়জয়,
জানিয়া বিশ্বে নয়,
সুললিত কণ্ঠস্বরে
সুর রাশী রাশী ॥
ওগো প্রিয় দেহ মোরে
সেই সার্থকতা।
তোমার চরণতলে,
যেন নিভে যাই জ্বলে,
জৈব অবসানে এই
একটি সলিতা ॥